লক্ষ লক্ষ চাকরিপ্রার্থীর চোখের জলের ঋণ শোধ করতেই হবে

— পৃঃ ৩৫

দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

ট্রেলারে পার্থ ছবিতে অন্য কেউ

— পৃঃ ২৭

৭৪ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা।। ৮ আগস্ট, ২০২২।। ২২ শ্রাবণ - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

কার টাকা কোথা থেকে এল?

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা, ২২ শ্রাবণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

৮ আগস্ট - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

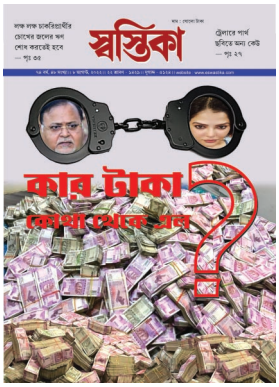

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

'ঠাকুরঘরে কে? আমি তো কলা খাইনি' ধ্বংসের মুখে তৃণমূলের যদুবংশ □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

কে তুমি বাবা ভাইপো? □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

ভারতের প্রথম নাগরিক এবং জনজাতিদের নয় শতাংশ □ অমিত শাহ □ ৮

রাজ্যের বর্তমান শাসকদলের শেষের দিনের ইঙ্গিত মিলছে □ বিশ্বামিত্র □ ১০

পাকিস্তানকে হটিয়ে ভারতের হাত ধরতে চায় পিওকে □ দিব্যেন্দু বটব্যাল □ ১১

সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকের জন্যই সন্ন্যাসী খুনে উদাসীন কংগ্রেস □ সুকল্প চৌধুরী □ ১৩

ভারতীয় মুদ্রার অবমূল্যায়নের হার বেশিরভাগ দেশের চেয়ে কম □ আনন্দমোহন দাস □ ১৬

ভগবান বাঙ্গালিকে সুবুদ্ধি দেবেন এটাই কাম্য □ রামানুজ গোস্বামী □ ১৮

কংগ্রেসের ডিএনএ-র দাম দিচ্ছে তৃণমূল □ বিমল শঙ্কর নন্দ □ ২৩

ট্রেলারে পার্থ, ছবিতে অন্য কেউ □ ভবানী শঙ্কর বাগচী □ ২৬

ভারতে প্রীতিবন্ধনের উৎসব রাখিবন্ধন □ সরোজ চক্রবর্তী □ ৩১

রামকানাই অধিকারী প্রতিষ্ঠিত ঝুলনযাত্রা □ সপ্তর্ষি ঘোষ □ ৩৩

ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেবাধর্মের দীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন শ্রীশ্রী শান্তিকালী মহারাজ □ বনমালী দাস □ ৩৪

লক্ষ লক্ষ চাকরিপ্রার্থীর চোখের জলের মূল্য চোকাতেই হবে □ অতনু দাস □ ৩৫

বিজেপি চায় না শিবসেনা তলিয়ে যাক □ দুর্গাপদ ঘোষ □ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ৩০ □ অন্যরকম : ৩৭ □ রঙ্গম : ৩৮ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ স্মরণে : ৪৬ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৮ □ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে ১৫ আগস্ট ২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৫ আগস্ট ২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিচার

ব্রিটিশের অত্যাচারের নানা কাহিনির সঙ্গে আমরা পরিচিত। কিন্তু ব্রিটিশ আমলের বিচার ও শাস্তি দেবার রীতিনীতির কাছে বাকি সব অত্যাচার নগণ্য বলে মনে হয়। স্বস্তিকার আগামী (১৫ আগস্ট) সংখ্যার বিষয়— 'স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিচার'। এই সংখ্যায় আলোচিত হবে ক্ষুদিরাম ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনাদের বিচার ও শাস্তি প্রসঙ্গ। থাকবে নৌ বিদ্রোহ নিয়ে একটি বিশেষ রচনা। লিখবেন পূরবী রায়, জিষ্ণু বসু, বিনয়ভূষণ দাশ, কর্নেল কুণাল ভট্টাচার্য প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

বিশেষ ঘোষণা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজ বাঙ্গলায় গত ১৯৩৯ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে। সেই কাজে বাঙ্গলা তথা ভারতের বহু কার্যকর্তা ও প্রচারকের পরিশ্রম নিহিত আছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রয়াত, অনেকে খুবই বৃদ্ধ। তাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বাঙ্গলার সঙ্ঘকাজের প্রারম্ভিক ইতিহাস তুলে ধরা প্রয়োজন। এই কাজ স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট হাতে নিয়েছে। আগামী শুভ জন্মাষ্টমী, ২০২২ তিথিতে '**বাঙ্গলায় সঙ্ঘ কাজের ইতিহাস**' নামক এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে চলেছে। সহযোগ রাশি ২৫০/ টাকা।

ডাকযোগে বইটি নিতে হলে ডাক খরচ বাবদ ৫০/ টাকা অতিরিক্ত লাগবে।

জেলা অনুসারে অথবা ব্যক্তিগত ভাবে টাকা পাঠাতে পারেন। সরাসরি টাকা ব্যাংকে পাঠানোর জন্য নীচে ব্যাংকের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো। টাকা ব্যাংকে পাঠানোর পর তপন সাহা (মো: ৯৯০৩০০২৯০১) অথবা মহেন্দ্র নারায়ণ দাস (মো : ৯৪৭৭৩৯৯২৯৭)— এই দু'জনের কাউকে অবশ্যই জানাবেন।

বইটি কীভাবে সংগ্রহ করবেন তা লিখে জানাবেন। ডাকযোগে নিতে হলে অতিরিক্ত ৫০/ টাকা ডাকমাশুল পাঠাবেন।

Account Name : **SWASTIK PRAKASHAN TRUST**
A/C. No. : **0954000100121397**
IFS Code : **PUNB0095400**
Bank Name : **PUNJAB NATIONAL BANK**
VIVEKANAND ROAD
Kolkata - 700 006

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

চোরের রাজত্বের অবসান হোক

ভারতবর্ষ তো বটেই, বিশ্ব দরবারেও একদা বাঙ্গলা ও বাঙ্গালির স্থান উচ্চ স্থানে বিরাজিত ছিল। বাঙ্গলা তথা ভারতের নবজাগরণে বাঙ্গালির নেতৃত্ব সমগ্র জাতি সানন্দে স্বীকার করিয়াছিল। বাঙ্গালি মনীষার প্রতি সম্মান জানাইয়া মহামতি গোখলে সেইদিন বাঙ্গলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালির সেই গৌরব দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। স্বাধীনতার পূর্ব হইতেই বাঙ্গালির চিন্তা চেতনার অবনমন শুরু হইল। ফলস্বরূপ বাঙ্গালি তাহার ভূমিটুকুও হারাইতে বসিয়াছিল। ভাগ্যগুণে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং তাহার কতিপয় সহযোগীর অক্লান্ত পরিশ্রমে বাঙ্গালি তাহার অস্তিত্ব রক্ষার ভূমিটুকু পাইয়াছে। যাহার নাম পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ পাইয়া বাঙ্গালি ভাবিয়াছিল এইবার বোধহয় তাহাদের সুখের দিন আসিল। কিন্তু অচিরেই বাঙ্গালি দেখিল রাজনীতির কুটিল ঘূর্ণাবর্তে পশ্চিমবঙ্গ নিমজ্জিত হইতে শুরু করিয়াছে। সত্তরের দশকে নকশালি ক্রিয়াকলাপ এই রাজ্যের মাটি নিরীহ মানুষের রক্তে লাল করিয়া তুলিল। তাহার পর শ্রেণীশত্রু খতমের নামে দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর কমিউনিস্টদের শাসনে হিংসা প্রতিহিংসার খেলায় এই বঙ্গভূমি ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। তাহাদের রাজত্বকালে শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের অবনমন ঘটিয়াছে। কমিউনিস্ট শাসনের অবসান হইবার পর বিগত এগারো বৎসরে বর্তমান শাসক ও শাসকদল যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাও শেষ করিয়া ফেলিল। বাঙ্গলা আজ হাহাকারের রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালি আজ দেশে বিদেশে উপহাসের পাত্র হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালির আজ মুখ লুকাইবার ও মুখ দেখাইবার কোনো জায়গা রহিল না।

রাজ্যের বর্তমান শাসক ও শাসকদল বাঙ্গলা ও বাঙ্গালিকে আজ একেবারে নগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে। সর্বদিক হইতে বাঙ্গালিকে নিঃস্ব ও রিক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। দান খয়রাতির রাজনীতি করিতে করিতে রাজ্যের কোষাগার শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। রাজ্যে কর্মসংস্থান নাই, নিয়োগ নাই। লক্ষ লক্ষ মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক হইয়া অন্য রাজ্যে পাড়ি দিয়াছে। বিভিন্ন 'শ্রী' ও 'ভাণ্ডার' প্রকল্পের লোভ দেখাইয়া মানুষকে প্রায় ভিখারিতে পরিণত করিয়াছে। টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের বঞ্চিত করিয়া অযোগ্য ও দলদাসদের চাকুরি দেওয়া হইয়াছে। চাকুরি প্রার্থীদের নিকট হইতে ঘুষ লওয়া হইয়াছে। ইহা স্বয়ং রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী করিয়াছেন। এই মুহূর্তে নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির তদন্তে শুধু এই রাজ্যই নহে, সমগ্র দেশ তোলপাড় হইতেছে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষক নিয়োগের নামে ঘুষ লইয়া টাকার পাহাড় সৃষ্টি করিয়াছেন। আয়করের কর্তা ব্যক্তিরা তাহাকে বামাল গ্রেপ্তার করিয়াছেন। রাজ্যের মানুষ আজ শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া চোর চোর বলিয়া চিৎকার করিতেছে। এই ঘটনায় বাঙ্গালির মাথা হেট হইয়া গিয়াছে। দুর্নীতিতে বর্তমান শাসকদলের সর্বস্তরের নেতা-মন্ত্রী আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছেন।

প্রশ্ন উঠিতেছে, ইহার পরও কি বাঙ্গালির সংবিৎ ফিরিবে না? বাঙ্গালি কি চোরেদের রাজত্ব মানিয়া লইবে? বাঙ্গালি কি তাহাদের হৃতগৌরব উদ্ধারে সচেষ্ট হইবে না? আজ বাঙ্গালির স্মরণ করিবার দিন আসিয়াছে যে, বিহার একদিন চোরেদের রাজত্বে পরিণত হইয়াছিল। ভারতে ও সমগ্র বিশ্বে বিহারবাসী উপহাসের পাত্র হইয়াছিল। কিন্তু বিহারবাসী সেই অন্ধকারের রাজত্বের অবসান ঘটাইয়া আলোয় ফিরিয়াছে শুধু নয়, বিহার রাজ্য আজ অতি সম্মানের স্থানে অবস্থান করিতেছে। আইএএস, আইপিএসে আজ বিহার রাজ্য প্রথম সারিতে। সমগ্র ভারতের মধ্যে বিহার আজ মাদকমুক্ত রাজ্যের সম্মান লাভ করিয়াছে। বিহারবাসী যদি চোরের রাজত্বের অবসান ঘটাইতে পারে তাহা হইলে বাঙ্গলার বাঙ্গালিরা কেন পারিবে না। বাঙ্গালিকে আজ এই মুহূর্তেই চোরের রাজত্বের অবসান ঘটাইবার শপথ লইতেই হইবে। আর তাহা করিতে পারিলেই বাঙ্গালি আবার স্বমহিমায় বিরাজিত হইতে পারিবে।

সুভাষিতম্

মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।

তয়োঃ ফলং তু তুল্যং হি ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ।।

মূর্খেরা বলে বিষ্ণায় নমঃ, যা একেবারে অশুদ্ধ। আর জ্ঞানীরা বলেন বিষ্ণবে নমঃ, যা ব্যাকরণসম্মত শুদ্ধ। কিন্তু দুটির ফলই এক। কেননা ঈশ্বর শব্দ নয়, মনের ভাবটুকুই গ্রহণ করেন।

‘ঠাকুর ঘরে কে? আমি তো কলা খাইনি’ ধ্বংসের মুখে তৃণমূলের যদুবংশ

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

‘সকল পক্ষী মৎস্যভক্ষী, কেবল মাছরাঙাটাই কলঙ্কিনী?’ কিংবা ‘অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি’ (শতবার ধুলেও কয়লার ময়লা যায় না)--- রাজনৈতিকভাবে এই বাক্যদ্বয় এ রাজ্যের জন্য এখন ভীষণ রকমের প্রাসঙ্গিক। বাইশ বছর আগে তহলকা ঘুষকাণ্ডের প্রতিবাদ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব ছেড়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্য পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে বেআইনি সম্পত্তি রাখা আর অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমার ধারণা পার্থবাবুর আচমকা গ্রেপ্তার মমতার সিলেবাসের বাইরে ছিল। পার্থবাবু যে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত মমতা কি জানতেন না? না জানলে দল আর প্রশাসন থেকে তাঁর অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত। কারণ এর থেকে প্রমাণ হয় দুটি ক্ষেত্রেই তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন। দলের সুপ্রিমোর নাকের ডগা দিয়ে অবাধে দুর্নীতি চলছে আর সুপ্রিমো আটকাতে পারছেন না বা ইচ্ছা করে আটকাচ্ছেন না, এর থেকে আর লজ্জার কী হতে পারে? পার্থবাবুকে প্রশাসন ও দলের সব পদ থেকে সরিয়ে দিলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। প্রশাসন কিংবা দলের খোলনলচে পালটে দিলেও নয়। কারণ সমস্যা থেকে এড়িয়ে বা পালিয়ে যাওয়াও এক ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা।

যদি ধরেন পার্থবাবুর কাণ্ডকারখানা মমতা জানতেন না তাহলে কে এই কাণ্ড বাধাল? পার্থবাবুর দাবি— এটা ষড়যন্ত্র, আর বেআইনি টাকা তাঁর নয়। তাহলে পিছনে কে? নিশ্চয় এমন কেউ আছেন যিনি মমতার শাসানি আর হুমকির তোয়াক্কা করেন না। তাই তাঁর আস্থাভাজন পার্থবাবুকে ধরিয়ে দিয়েছেন। তাই তাঁকে না চিনলেও যিনি এই জঘন্য আর ন্যক্কারজনক মুখোশ খুলে দিয়েছেন আমি তাঁকে সাধুবাদ জানাই। দেশের সর্বস্তরেই এই ধরনের ‘হুইসল ব্লোয়ার’ প্রয়োজন তা সে যে কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধেই হোক বা যে কোনো প্রশাসন।

এই মুহূর্তে পার্থবাবুর পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির প্যাঁচে পড়ে ঘুম ছুটে গিয়েছে তৃণমূল নেতাদের। গলার কাঁটা নামাতে তাঁরা উঠে পড়ে লেগেছেন। পার্থবাবুর ‘পাপের টাকা’ তৃণমূলের নয়— এই উদ্ভট আর মিথ্যা তত্ত্ব প্রমাণ করতে তারা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। দলের ২০ সদস্যের জাতীয় কমিটির মধ্যে ৮ জনের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় তদন্ত চলছে। কেবল পার্থবাবু ধরা পড়েছেন। আমার আন্দাজ আগামীতে বাকিরাও ধরা পড়বে আর তৃণমূল দলটাই হয়তো দুর্নীতির আখড়া বলে সাব্যস্ত হবে। যেমন হয়েছিল মায়াবতী ও জয়ললিতার ক্ষেত্রে। ২১ জুলাই দলীয় সমাবেশ থেকে মমতা আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন। তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ছন্দপতন হয়। এটা ভাবতে অবাক লাগছে তাঁরা কি জানতেন না যে দুর্নীতি আর বেআইনি কারবার তৃমমূলের ঘরে জাঁকিয়ে বসেছে? নাকি সব জেনে বুঝেও খানিকটা ইচ্ছা করে চোখ উলটে রেখেছিলেন।

সাহসের অভাবে অনেক নেতা আড়ালে আবডালে দলের কুকীর্তির কথা বলে ছি ছি করছেন। কেউ-বা আবার মহাভারতে যদুবংশ ধ্বংসের উদাহরণ তুলছেন।

বিরোধীরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘ফাউন্টেনহেড অব কোরাপশন’ বা ‘দুর্নীতির ফোয়ারা’ বলে ডাকেন। এখন পর্যন্ত মমতার বিরুদ্ধে কোনো তদন্ত হয়নি বা প্রত্যক্ষ অভিযোগ নেই। পার্থবাবুর গ্রেপ্তারের পর সে সম্ভাবনা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। অনেকে বলছেন পার্থবাবু সব ফাঁস করে দিলে মমতার ‘ম্যাডাম ক্লিনের’ ভাবমূর্তি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এমনকী মমতার বিরুদ্ধে তদন্ত হতে পারে। তবে এখন অবধি পার্থবাবু তাঁর নেত্রীর হাত ছাড়েননি। মমতার পাশেই রয়েছেন। তাঁকে ঘিরে মমতা যা বলেছেন পার্থবাবু সবেতেই সায় দিয়েছেন। বিরোধিতা করেননি। সেটা কতদিন? তাই দেখার।

সাহসের অভাবে অনেক নেতা আড়ালে আবডালে দলের কুকীর্তির কথা বলে ছি ছি করছেন। কেউ-বা আবার মহাভারতে যদুবংশ ধ্বংসের উদাহরণ তুলছেন। এক সময় অভিষেককে অকেজো করে দিতে ‘সপ্তরথী’র চক্রব্যূহ রচনা করেছিলেন পার্থবাবুরা। মমতা সে চেষ্টায় জল ঢেলে দেন। ভোট পরামর্শদাতা সংস্থা আই প্যাককে সঙ্গী করা নিয়ে দলের সাত নেতা রাতারাতি অভিষেক বিরোধী হয়ে ওঠেন। তাঁদের ধারণা হয় অভিষেক দলে বৃদ্ধতন্ত্র শেষ করতে উদ্যত। তারপর থেকেই তৃণমূল আড়াআড়ি ভাগ হয়ে যায় আর শুরু হয় পারস্পরিক আকচা-আকচির পালা। তাই হয়তো মাছরাঙাকেই (পড়ুন পার্থবাবুকে) কলঙ্কিত সাজানো হচ্ছে। এখন দেখার, দেশজুড়ে তৈরি হওয়া কয়লার ময়লা আদৌ ধোওয়া যাবে কিনা। না হলে সোনার বাংলার স্বপ্ন অধরা থেকে যাবে। □

তুমি কে বাবা ভাইপো?

সর্বঘটেষু ভাইপো,

আপনি তো আবার পিসিকে দিদি বলেন। কিন্তু পার্থ কী দাদা না মামা? দল থেকে তাড়িয়েছেন বাধ্য হয়ে। অবশ্য উপায়ও ছিল না। যে ভাবে দলকে ঠিকঠাক ভাগ না দিয়ে কোটি কোটি টাকা জমিয়েছেন তাতে এমন শাস্তি পাওয়াই উচিত।

কিন্তু ভাইপো আপনি সরকারের কে? এতকাল চাকরির জন্য আন্দোলনকারীদের দিকে কারও নজর ছিল না। পার্থ গ্রেপ্তার হয়ে দলের ষড়যন্ত্রের কথা বলতেই আপনি সেদিন নিজের ক্যামাক স্ট্রিটের ঝাঁ-চকচকে অফিসে ডেকে নিলেন আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিকে। বয়সে আপনি ছোটো হলেও আপনার এক ডাকে গুটি গুটি পায়ে চলে এলেন শিক্ষামন্ত্রী। তার পরে ভিতরে কী হয়েছে কেউ জানে না। তবে আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, তাঁরা খুশি। কারণ, 'অত্যন্ত ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে।' আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধি শহিদুল্লাহ বলেন, 'স্যার (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং শিক্ষামন্ত্রী (ব্রাত্য বসু) আমাদের সমস্যার প্রতি অত্যন্ত আন্তরিক। তাঁরা আমাদের সাহায্য করার ১০০ শতাংশ চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছেন। ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। আমরা খুশি।'

এই 'ইতিবাচক আলোচনা' নিয়েই আমার মনে তৈরি হয়েছে নতুন প্রশ্ন। চাকরির প্রতিশ্রুতি বা আশ্বাস দিতে পারে সরকার। দিতে পারে শিক্ষা দপ্তর। অভিষেক আপনি তো সরকারের কোনও পদে নেই। আপনি শাসকদলের একজন সাংসদ। আঞ্চলিক দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। কিন্তু সেই অবস্থান থেকে আপনি সরকারি চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দিতে পারেন কি? আপনার সঙ্গেই ওই বৈঠকে ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি অবশ্য সরকারের প্রতিনিধি। কিন্তু তা নিয়েও প্রশ্ন আছে আমার। আপনার দপ্তর, যা আদতে দলীয় দপ্তর, সেখানে বসে শিক্ষামন্ত্রীই-বা কী করে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করলেন? শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে ব্রাত্যের ওই বৈঠক করার কথা তো তাঁর সরকারি দপ্তরে!

> **পার্থর বান্ধবীর ঘরে কোটি কোটি টাকা থাকলেও সরকারের কোষাগার ফাঁকা। সরকারি কর্মচারীদের ডিএ পুরোপুরি দেওয়া যাচ্ছে না। কেন্দ্র আবার বলে দিয়েছে, ঠিকঠাক হিসাব না দিতে পারলে কোনও টাকা হবে না।**

আপনি এখন অবশ্য সর্বঘটে কাঁঠালি কলার মতো আচরণ করছেন। নিজের এক্তিয়ার খেয়াল রাখছেন না। এই তো একুশে জুলাই আপনার দলের সমাবেশে আপনি রাজ্য সরকারের হয়ে কত কী বলে গেলেন। বললেন, 'কেন্দ্র বাংলার টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। ১০০ দিনের কাজের ৯ হাজার কোটি টাকা বন্ধ করেছে কেন্দ্র। সড়ক যোজনার সাড়ে চার-পাঁচ হাজার কোটি টাকাও বন্ধ। বাংলা আবাস যোজনায় সাড়ে ছ' হাজার কোটি বন্ধ। বিজেপির নেতারা বলেছে মোদীকে বলে বাংলার টাকা বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু তাতে বাংলার ক্ষতি ওরা করতে পারবে না। বাংলার নিজের টাকা নিজেই জোগাবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে সময় দিন। তবে কেন্দ্রের চাপে পড়ে আমরা মাথা নোয়াবো না। কেন্দ্র চেয়েছিল কেন্দ্রের নামে প্রকল্প করতে হবে, তবেই টাকা দেবে কেন্দ্র। কিন্তু অন্য দলগুলির মতো এই চাপের কাছে আত্মসমর্পণ করিনি। আমরা বলেছি, বাংলার প্রকল্প হলে শুধু বাংলার নামেই হবে। বাংলা আবাস যোজনা হবে। বাংলা সড়ক যোজনা হবে। তাতে যদি কেন্দ্র টাকা না দিতে চায় বাংলার সেই টাকা লাগবে না। বাংলা কেন্দ্রের ভরসায় ছিল না। থাকবেও না। বাংলাই নিজের রাস্তা নিজে বানাবে।'

কিন্তু আপনার পিসি থুড়ি দিদি তো অন্য কথা বলছেন। তিনি তো টাকার দাবিতে দিল্লি গিয়ে আন্দোলন করবেন বলেছেন। তিনিই তো সরকারের মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে আপনি কী করে বলে দিলেন টাকা লাগবে না? জানেন, আপনার পিসির কষ্টের কথা? টাকার অভাবের কথা? পার্থর বান্ধবীর ঘরে কোটি কোটি টাকা থাকলেও সরকারের কোষাগার ফাঁকা। সরকারি কর্মচারীদের ডিএ পুরোপুরি দেওয়া যাচ্ছে না। ওদিকে কেন্দ্র বলে দিয়েছে, ঠিকঠাক হিসাব না দিতে পারলে কোনও টাকা হবে না।

ও ভাইপো, আপনি ২১ জুলাই বলেছিলেন, 'এই তৃণমূল বিশুদ্ধ লোহা। এই দলকে যত তাতাবে ততই শক্ত হবে।' ব্যাস, পরের দিন থেকেই কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হতে শুরু করেছে। □

অতিথি কলম

অমিত শাহ

ভারতের প্রথম নাগরিক এবং জনজাতিদের ৯ শতাংশ

দ্রৌপদী মুর্মুর রাষ্ট্রপতির পদাসীন হওয়া দ্ব্যর্থহীন ভাবে মোদী সরকারের জনজাতিদের ক্ষমতায়নের দায়বদ্ধতার অকাট্য প্রমাণ। নিঃসন্দেহে এই নির্বাচন ভারত ইতিহাসের একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। বিশেষ করে ভারতের মতো বিশাল গণতান্ত্রিক দেশে। ওড়িশার প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক দরিদ্র গ্রামীণ সাঁওতাল পরিবারে জন্ম নেওয়ার পর দেশের প্রধান নাগরিক হওয়ার আশ্চর্য যাত্রাপথ ছিল কঠিন সংকল্প, লড়াই ও প্রতিভার স্ফুরণের অবিশ্বাস্য কাহিনি।

এমন একজন শতাব্দীব্যাপী পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষের সর্বোচ্চ পদে উত্তরণ সমগ্র ভারতবাসীর পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের। বিশেষ করে জনজাতি সম্প্রদায়ের কাছে এটি অভূতপূর্ব সাফল্যের মুহূর্ত। একই সঙ্গে যথেষ্ট হতাশারও বটে। কেননা স্বাধীনতা পাওয়া থেকে দীর্ঘ ৭০ বছর লাগল একজন জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের সর্বোচ্চ পদে পৌঁছতে। সেই জন্যই এই মুহূর্তটি মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের ভারতের গণতন্ত্র ও সংবিধানের সর্বোচ্চ মর্যাদা রক্ষায় সফল হওয়ার গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্ত।

সকলেই জানেন জনজাতিরা (তপশিলি উপজাতি) আমাদের জনসংখ্যার ৯ শতাংশ। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে স্বাধীনতার পর অধিকাংশ সরকারই তাদের উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য কোনও প্রচেষ্টা নেয়নি যাতে তারা দেশের মূলস্রোতের অংশীদার হতে পারে। একই সঙ্গে তারা গুরুত্বপূর্ণ অফিস বা কার্যালয়গুলিতেও যোগ দেওয়ার সুযোগ পায়নি।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীই প্রথম তৎপর হয়েছিলেন জনজাতি সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে। ১৯৯৯ সালে তিনিই প্রথম উপজাতি কল্যাণের জন্য একটি পৃথক মন্ত্রক তৈরি করেন। এরপর ২০০৩ সালে সংবিধান সংশোধনের (৮৯তম) মাধ্যমে

National Commission for Scheduled tribes গঠিত হয়। উপজাতি সম্প্রদায়ের নতুন জাগরণের এবং মূলধারায় সংযোজনের যে প্রচেষ্টা বাজপেয়ী শুরু করেছিলেন মোদী তাকে আরও সংকল্পবদ্ধ ও দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। মোদীরই গৃহীত নীতি সব কা সাথ, সব কা বিকাশ, সব কা বিশ্বাস এবং সব কা প্রয়াসকে সফল করতে তাঁর সরকার বহু প্রকল্প ও পরিকল্পনা নিয়েছে যাতে জনজাতিদের আশা ও স্বপ্নের সফল রূপায়ণ হয়। গত আট বছরের বাজেটগুলিতে জনজাতি উন্নয়নখাতে বিশালাকারের অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে। এই বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে তাদের সম্প্রদায়ের অগ্রগতিই যাতে নির্দিষ্ট করে প্রাধান্য পায় সেদিকে নজর রয়েছে। ২০১৩-১৪ সালে উপজাতি সাব প্ল্যান বাজেটের পরিমাণ ছিল একুশ হাজার কোটি টাকা যা ২০২১-২২-এ ৮৬ হাজার কোটি ছুঁয়েছে। 'জলজীবন' মিশনের অধীনে ১.২৮ কোটি জনজাতি বাড়িতে নলবাহিত জল সরবরাহের প্রকল্প চলছে। নতুন ৩৮ লক্ষ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি, ১.৪৫ কোটি শৌচালয় ও আয়ুষ্মান ভারতের অধীনে ৮২ লক্ষ স্বাস্থ্য কার্ড দেওয়ার প্রকল্পগুলি দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। একইভাবে একলব্য আদর্শ বিদ্যালয় যা বিশেষভাবে জনজাতিদের প্রয়োজন অনুযায়ী নির্মিত হচ্ছে তার বরাদ্দ ২৭৮ কোটি থেকে ১৪১৮ কোটি টাকা করা হয়েছে। জনজাতিদের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে মোধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মেধা ভরতুকি ৯৭৮ কোটি থেকে ২৫৪৬ কোটি করা হয়েছে। অন্যদিকে উদ্যোগপতি নির্মাণ প্রকল্পে ৩১০০ 'বনধন স্বনির্ভর গোষ্ঠী'

নির্মাণে ৩২৭ কোটি টাকা দেওয়ার অনুমোদন হয়েছে।

লক্ষণীয়, আমাদের দেশের খননকার্য (খনিজ উৎপাদন) অধিকাংশ জনজাতি অঞ্চলেই হয়ে থাকে। এর দ্বারা যে ব্যবসায়িক লাভ হয় তার কোনো অংশ কখনই স্থানীয় জনজাতিদের মধ্যে বণ্টিত হয় না। এই অবহেলা থেকে বেরিয়ে আসতে এই সরকার একটি জেলা ভিত্তিক খনিজ কেন্দ্র তৈরির প্রকল্প চালু করেছে যেখানে খনিজ উৎপাদন থেকে আয়ের ৩০ শতাংশ স্থানীয় জনজাতি অঞ্চল উন্নয়নে খরচ করতে হবে। ইতিমধ্যেই এই নিয়মে ৫৭ হাজার কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে যা বিভিন্ন জনজাতি উন্নয়ন প্রকল্পে খরচ করা হচ্ছে। জনজাতি সম্প্রদায়ের নিজেদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করার বিশেষ কেন্দ্রের সংখ্যা ২৯ থেকে ১১৬টি করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী একইসঙ্গে সমৃদ্ধ জনজাতি সংস্কৃতি এবং তাদের গৌরবময় উত্তরাধিকারকে জাতীয় পাদপ্রদীপের আলোয় তুলে এনেছেন। উপজাতি শিল্প, সাহিত্য, চিরাচরিত জ্ঞান, লোকাচার এবং বিশেষ দক্ষতার বিষয়গুলি পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংযোজিত হয়েছে। স্বাধীনতার এই ৭৫ বর্ষ উদ্‌যাপনে জনজাতিদের কেন্দ্র করে একাদিক্রমে বহু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে এই সম্প্রদায়ের বীরত্ব ও অবদানের কথা সারা দেশে বিশেষ মর্যাদায় প্রদর্শিত হচ্ছে।

আগামী ১৫ নভেম্বর জনজাতিদের সর্বাপেক্ষা বরণীয় ও আরাধ্য পুরুষ ভগবান বিরসা মুণ্ডার শতবর্ষে পদার্পণের দিনটিকে জাতীয় 'জনজাতি গৌরব দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়া বাজেটে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জনজাতি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণে জাদুঘর নির্মাণের প্রকল্প শুরু হয়েছে।

এই সূত্রে মোদী তাঁর বহু বক্তৃতায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জনজাতি সম্প্রদায়ের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা তুলে ধরে আজকের প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত এবং তাদের সম্পর্কে অবহিত করার চেষ্টা করেন। এই বিবরণগুলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় বর্তমান সরকার জনজাতি কল্যাণ এবং তাদের ক্ষমতায়নে কতটা আন্তরিকভাবে সচেষ্ট।

ভুলে গেলে চলবে না কাশ্মীর থেকে সুদূর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনজাতিরা আমাদের বিস্তীর্ণ গ্রামীণ পরিমণ্ডলকে ঘিরে রেখেছে। তাঁরাই সেখানে জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশ। বিশেষ করে ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, রাজস্থান ও গুজরাট ব্যাপকভাবে জনজাতি অধ্যুষিত। পরিতাপের বিষয় যে, স্বাধীনতার পর কংগ্রেস অধিকাংশ জনজাতিবহুল এলাকা বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে নিতান্তই অবহেলা করে এসেছে।

নরেন্দ্র মোদী কিন্তু ক্ষমতায় আসার অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেশের জনজাতি অধুষিত অঞ্চলগুলির আমূল পরিবর্তনের সংকল্প নেয়েছেন। লক্ষ্য পূরণের প্রথম ধাপ হিসেবে উন্নয়নকে হাতিয়ার করে তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দিকে নজর দেন। যার পোশাকি নাম 'Act East'। জনজাতি বহুল অঞ্চলের পরিকাঠামোয় ব্যাপক পরিবর্তনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এর ফলে গত আট বছরের মধ্যেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি সফলভাবে দেশের মূলধারার অংশ হয়ে যাবতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অংশীদার হতে পেরেছে।

কয়েক দশক ধরেই দারিদ্র্য ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ছিল দেশের জনজাতি সম্প্রদায়ের কাছে দৈনিক সমস্যা। এই অসহায় পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েই বামমার্গী চরমপন্থীরা জনজাতি অঞ্চলগুলিতে তাদের ডালপালা বিস্তার করতে শুরু করে। এরই পরিণতিতে বেশ কিছু এলাকায় উন্নয়ন ও সরকারি প্রকল্পের কাজ নষ্ট হয়ে যায়। এই পটভূমিতেই মোদী সরকারের চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের নীতির প্রয়োগ তাদের প্রায় নির্মূল করে দেয়। হিংসা ও অস্থিরতা জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে হটে গিয়ে সেখানে স্থায়ী শান্তি ও দীর্ঘকালীন উন্নয়নের কাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

জনজাতি সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন একই সঙ্গে তাদের ক্ষমতায়নের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করানোয় অগ্রাধিকার বরাবরই বিজেপির আদর্শের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ। এরই চূড়ান্ত সাফল্য ও বাস্তবায়ন দেখা গেল শ্রীমতী মুর্মুর রাষ্ট্রপতি পদে উত্তরণের মাধ্যমে। মোদীজীর দৃঢ় নেতৃত্ব তাদের অভাবনীয় স্বপ্ন সফল করল। তারা আজ একথা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে যে প্রধানমন্ত্রী মোদী তাদের ওপর কতটা ভালোবাসা ও বিশ্বাস রাখেন।

(লেখক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী)

SARADA VIDYA MANDIR (CBSE)

Raiganj, Uttar Dinajpur

WALK-IN- INTERVIEW for the post of Asst. Teachers (PGT. B.Ed.); Subjects :- Pol. Sci., Economics & one office cleark -- Efficient in Comp. Date :- 14.08.22, Time - 10.30 a.m. Venue : School Campus, Salary negotiable.
CONTACT - 9474730044. 9474139325

রাজ্যের বর্তমান শাসক দলের শেষের দিনের ইঙ্গিত মিলছে

রাজ্যে প্রশাসনিক চিত্রটা এই মুহূর্তে বড়োই করুণ। রাজ্যের সদ্য প্রাক্তন শিল্প ও বাণিজ্য, তথ্যপ্রযুক্তি-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী, নিখুঁতভাবে বলতে গেলে মমতা মন্ত্রীসভার দুনম্বর ব্যক্তি পার্থ চট্টোপাধ্যায় এখন ইডির হেপাজতে। রাজ্যবাসীর যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, সেখানে তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর বাড়ি থেকে পঞ্চাশ কোটিরও বেশি নগদ টাকা উদ্ধার করেছে ইডি। মানুষের সন্দেহ, বেকারত্বের জ্বালায় চাকরিপ্রার্থীরা তাঁদের সহায় সম্বল বেচে যে টাকা উৎকোচ দিয়েছিলেন, সেই গুপ্তধনেই এই বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা হিসেবে সঞ্চিত রয়েছে। অনেকে এও মনে করেন, এখনো পর্যন্ত যে টাকা উদ্ধার হয়েছে তা আসলে হিমশৈলের চূড়ামাত্র। প্রবীণ সাংবাদিকদের বলতে শোনা গেছে, তাঁদের সুদীর্ঘ সাংবাদিক জীবনে এতো বিপুল পরিমাণ কালো নগদ টাকা উদ্ধার হতে তাঁরা দেখেননি।

শিক্ষা দুর্নীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারী। স্বজনপোষণ অর্থাৎ নিজের মেয়েকে বেআইনিভাবে স্কুলশিক্ষকের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে তাঁর মেয়ের চাকরি তো গেছেই, উপরন্তু গৃহীত অর্থও ফেরাতে হচ্ছে আদালতের নির্দেশে। বামফ্রন্ট সরকারের চৌত্রিশ বছরের শাসনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভয়াবহ হত্যালীলা যেমন দেখেছে— মরিচঝাঁপি থেকে নন্দীগ্রাম, তেমনি তৃণমূলের এগারো বছরের আমলে বঙ্গবাসী আর্থিক দুর্নীতির পরাকাষ্ঠা দেখে ফেললো। এর মানে এই নয় যে মানুষ বাম আমলে আর্থিক দুর্নীতি কিংবা হাল আমলে হত্যালীলা দেখেনি। মনে রাখতে হবে, বামআমলেই সঞ্চয়িতা চিটফান্ড কেলেঙ্কারি হয়েছিল, আর তৃণমূল গত বছর তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আসার পর ভোট পরবর্তী হিংসার যে বহর দেখিয়েছিল, প্রধান বিরোধীদলের সমর্থকেরা শাসকদলের পাশবিক উল্লাসের যে বলি হয়েছিল, তার বীভৎসতা বাঙ্গলার মানুষ ভোলেননি।

এই দুই আমলেই সামগ্রিকভাবে হিন্দুদের পরিণতি আরও শোচনীয় হয়েছে। ভোটব্যাংকের লোভে বিগত সরকার এবং বর্তমান সরকার উভয়ই নির্লজ্জ তোষণনীতি পোষণ করে এসেছে। আর এঁদের স্বার্থসিদ্ধির যুপকাষ্ঠে বলি হয়েছে হিন্দুরা। সুতরাং বিগত ৪৫ বছর ধরে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দারা রাজনৈতিক দুর্ভাগ্যের শিকার। অনেককাল বাঙ্গলায় এমন কোনো রাজনৈতিক নেতা আসেননি যিনি এই অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে বাঙ্গলার মানুষকে মুক্তি দিতে পারেন।

সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত কমিউনিস্টদের চুরিবিদ্যা আর দক্ষিণপন্থীদের চুরি করার ব্যাপারে প্রায়ই একটা গল্প শোনাতেন। যে দুটো বেড়াল একটা দুধের বাটি থেকে চুপচাপ দুধ চুরি করে খায়, তারপর মুখ মুছে চলে যায়। ফলে কেউ আর বেড়ালদুটোকে চোর বলে ধরতে পারে না। এই হচ্ছে বামপন্থা ঘরানার চুরি। আর দক্ষিণপন্থীরা হলে এই বেড়ালদুটিই কামড়াকামড়ি করে মুখময় এমন দুধ মাখিয়ে ফেলতো যে কারোর বুঝতে বাকি থাকতো না যে ওই বেড়ালদুটিই চোর। সম্প্রতিককালে তৃণমূলের যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের বঞ্চিত করে একের পর এক আর্থিক কেলেঙ্কারি যেভাবে প্রকাশ্যে আসছে, তাতে বরুণ সেনগুপ্তের গল্পটা মনে পড়তে বাধ্য।

মনে রাখতে হবে, তৃণমূল আমলের মন্ত্রী পরেশ অধিকারী কিন্তু বাম আমলেরই ফসল এবং তাঁর দুর্নীতির হাতেখড়িও কিন্তু বামফ্রন্ট জমানাতেই। তিনি নিজে খাদ্যমন্ত্রী থাকাকালীন খাদ্যদপ্তরে অবৈধ নিয়োগের অভিযোগ তুলেছেন কোচবিহার তৃণমূলেরই এক শ্রমিক নেতা। বামপন্থীরা এককালে স্লোগান দিতেন— শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব। এই স্লোগান দিতে দিতে তাঁরা শিক্ষাব্যবস্থাকে একপ্রকার লাটে তুলে, বিপ্লবের শিখণ্ডী খাড়া করে পার্টির ক্যাডার তৈরি করেছিলেন। রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদও ধ্বংস হয়েছিল বাম আমলেই। এক প্রাজ্ঞ রাজনীতিক বলেছেন, 'বামপন্থীদের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রীর নাম মমতা ব্যানার্জি।' এই মন্তব্যের সারবত্তা উপলব্ধি না করার কোনো কারণ নেই। একদিকে মমতার সরকারের মন্ত্রীদের সীমাহীন আর্থিক দুর্নীতির জন্য রাজ্যে কর্মহীনতা, বেকারত্বের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, অন্যদিকে সামাজিক প্রকল্পের নামে পার্টির সমর্থকদের কিছু পাইয়ে দিয়ে, কপাল ভালো থাকলে সাধারণ মানুষও তার ছিটেফোঁটা বা উচ্ছিষ্ট পান। তার বিনিময়ে রাজ্যের বিপুল সংখ্যক মানুষের ভোট কিনে নিয়ে ক্ষমতায় রয়েছে তৃণমূল।

তবে সব কিছুরই একটা শেষ রয়েছে। অনেকের মনে থাকতে পারে, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সেই অভ্রংলিহ অহমিকা— 'আমরা ২৩৫ ওরা ৩০'। তার পরের নির্বাচনেই তাঁর দলের চূড়ান্ত নির্বাচনী বিপর্যয় হয়েছিল, আজকে তারা শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছে। কথায় আছে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে ২০০৬-০৭ সালের গুরুত্ব সবাই জানে।

সুদীর্ঘকালের বাম জমানারও যে অবসান ঘটানো সম্ভব, তার অবসানেরও যে দরকার আছে, সেটা রাজ্যবাসী ওই সময় থেকেই মনে মনে ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলেন। সংকল্পও নিয়ে ফেলেছিলেন। সেদিনের সঙ্গে রাজ্যের রাজনৈতিক বাস্তবতার আজ বড়ো মিল। একসময় সিপিএমকেও অপরাজেয় মনে হতে, বিশেষ করে ২০০৬ সালে বিপুল জনাদেশ নিয়ে ক্ষমতায় ফেরার পরে ২০০৯-এর লোকসভা ভোটে ও ২০১১-এর ভোটে তাদের হাঁড়ির হাল যে এমন হবে রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্‌বক্তারাও এতটা অনুমান করতে পারেনি। আজও সন্তানহারা মায়ের কান্না, চাকরির জন্য শেষ সম্বল হরানো বেকারের কান্নায় বাতাস ভারী হয়ে এসেছে। এই জমানারও শেষের সেদিনের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। □

পাকিস্তানকে হটিয়ে ভারতের হাত ধরতে চায় পিওকে

পাক অধিকৃত কাশ্মীরের রাজনৈতিক নেতা আমজাদ জাফেরি এবং আরিফ জাকারিয়া ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। তাদের বক্তব্য, পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের ইচ্ছেও এরকমই।

দিব্যেন্দু বটব্যাল

একটা মোচড়েই দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিতে বেশ হইচই ফেলে দিয়েছে ভারত। বস্তুত পাকিস্তানের তো ঘুমটুম উড়ে যাওয়ার দশা। স্বস্তিতে নেই চীনও। ২৬ জুলাই ছিল কার্গিল বিজয় দিবস। এই দিন কাশ্মীরের লালচকে একটি অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ বলেন, 'এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না যে, শিবস্বরূপ বাবা অমরনাথ থাকবেন ভারতে আর শক্তিস্বরূপা মা সারদা থাকবেন পাক অধিকৃত কাশ্মীরে।' তিনি মনে করিয়ে দেন, ১৯৯৪ সালে সংসদে একটি প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ১৯৪৮-এর যুদ্ধে পাকিস্তান কাশ্মীরের এই অংশ অন্যায় ভাবে দখল করে। সেই কারণে এখনও কাশ্মীরের এই অংশ পাকিস্তানের দখলেই আছে। রাজনাথ সিংহ এই বিবৃতি দেওয়ার দু'দিন পর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে প্রায় একই সুরে একটি মন্তব্য করেছেন। কাশ্মীরে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় তিনি বলেন, 'পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের মানুষ অনেকদিন ধরেই স্বাধীনতা চাইছেন। তাঁরা আবার ভারতে ফিরতে চাইছেন। এই অঞ্চলের প্রতিটি পরিবারের কোনও-না-কোনও সদস্য ৪৮-র যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের আত্মত্যাগের কী দাম দিয়েছে পাকিস্তান?'

স্বাভাবিক ভাবেই দত্তাত্রেয় হোসবলের এই বিবৃতি পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছে। সম্ভবত এই প্রথম তাদের কথা এভাবে কেউ বললেন। কিন্তু সাধারণ মানুষকে মানসিক সাহচর্য জোগানোর মধ্যেই এই জোড়া বিবৃতির গুরুত্ব আটকে নেই। যে সময়ে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই মুহূর্তে পকিস্তান মারাত্মক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। অর্থনীতির দিকপালদের মতে এভাবে চলতে থাকলে আর কয়েক মাসের মধ্যেই পাকিস্তানের অবস্থা শ্রীলঙ্কার মতো হবে। ভারত ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর, গত পঁচাত্তর বছর ধরে সেখানকার শাসকেরা দেশের উন্নতির কথা ভাবেনি।

পাক-অধিকৃত কাশ্মীরকে এখনই ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা না হলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের সুরক্ষা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই রাজনাথ সিংহ ও দত্তাত্রেয় হোসবলে পাক-অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন।

ঋণের টাকায় নবাবি করেছেন আর সাধারণ মানুষকে ভারতের বিরুদ্ধে হাজার বছর ধরে যুদ্ধ করার দিবাস্বপ্ন দেখিয়ে দেশকে রসাতলে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তান আমদানি-নির্ভর ও ঋণ-নির্ভর। ইমরান খানের আমলে পাকিস্তানের ঋণ নেওয়ার প্রবণতা অনেকটাই বেড়ে যায়। যার ফলে পাকিস্তানের রাজস্ব বাবদ আয়ের একটা বিরাট অংশ ঋণের সুদ মেটাতে ব্যয় হয়। এমনকী, এক দেশের ঋণ শোধ করার জন্য পাকিস্তান অন্য দেশ বা সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে— এরকম দৃষ্টান্তও অপ্রতুল নয়। এর ফলে এখন পাকিস্তানের আর্থিক পরিস্থিতি শোচনীয়। ফোরেক্স রিজার্ভ (বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডার) ৯.৪ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। ঋণ শোধ করা তো দূরের ব্যাপার, পাকিস্তান এখন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস (পেট্রেল- ডিজেল) পর্যন্ত আমদানি করতে পারছে না। দেশে প্রায় গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি। অবস্থা এতটাই খারাপ যে পাকিস্তানের বর্তমান সরকার দেশের সম্পদ বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের দুটি পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি সংযুক্ত আরব আমিরশাহির হাতে তুলে দেওয়া হবে, নয়তো বিক্রি করে দেওয়া হবে। তাতে কিছু ডলার পকেটে আসবে ঠিকই, কয়েক মাস হয়তো টেনেটুনে চলেও যাবে কিন্তু তারপর?

এইখানেই রয়েছে রাজনাথ সিংহ এবং

ফঃ ২

দত্তাত্রেয় হোসবলের দুটি বিবৃতির তাৎপর্য। পাকিস্তান খুব ভালো করেই জানে দেশের সম্পদ বিক্রি করে সরকার চালালে মানুষ সহ্য করবে না। সেনাও হালচাল দেখে বিগড়ে যেতে পারে। তাই পাকিস্তান পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট ও বালটিস্তান চীনকে লিজ দেবার কথা ভাবছে। প্রস্তাব পেলে চীন যে লুফে নেবে তা বলাই বাহুল্য। কারণ অনেকদিন ধরেই চীন পাকিস্তানে ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে মিলিটারি বেস ক্যাম্প বানানোর ছক কষছে। গিলগিট ও বালটিস্তানের দখল পেয়ে গেলে চীনের সেনাবাহিনীর নাগালের মধ্যে চলে আসবে জম্মু ও কাশ্মীর, দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। সুতরাং পাক-অধিকৃত কাশ্মীরকে এখনই ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা না হলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের সুরক্ষা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই রাজনাথ সিংহ ও দত্তাত্রেয় হোসবলে পাক-অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন।

পাক-অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলে শুধু যে ভারতের সুরক্ষা আরও মজবুত হবে, তা নয়— আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও খনিজ গবেষণার দিক থেকেও ভারত লাভবান হবে। আফগানিস্তান খুব কাছে চলে আসার ফলে ভারতীয় পণ্য খুব সহজেই আফগানিস্তান ও ইরান হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে পৌঁছতে পারবে। এতে সময় ও অর্থ দুইই বাঁচবে। এছাড়া, ইউরোপের বন্দরে পৌঁছনোও অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। চীনের সিপেক (চায়না অ্যান্ড পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোর) ও বিআরআই (বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিসিয়েটিভ) প্রকল্প দুটি চলে আসবে ভরত সরকার ও ভারতীয় সেনার নজরদারিতে। ভারতের গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি লাভ হবে প্রাকৃতিক সম্পদের মাধ্যমে। পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে প্রচুর খনিজ সম্পদ রয়েছে। বস্তুত এই কারণেই লাদাখ ও কাশ্মীরের ওপর চীনের এত লোভ। এখানে রয়েছে রেয়ার আর্থ মেটেরিয়ালের বিপুল ভাণ্ডার। এই রেয়ার আর্থ মেটেরিয়াল প্রক্রিয়াকরণের পর তৈরি হয় লিথিয়াম। এখন সারা পৃথিবী কার্বন নিঃসরণ কমাতে পেট্রোল- ডিজেলের ব্যবহার কমিয়ে গ্রিন এনার্জির গবেষণায় কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে। বিদ্যুৎচালিত গাড়ির ব্যবহার ভারত-সহ সব দেশেই বাড়ছে। বিদ্যুৎচালিত গাড়ির জন্য দরকার ব্যাটারি। আর ব্যাটারি তৈরির অন্যতম প্রধান উপাদান লিথিয়াম। চীন ইতিমধ্যেই সারা বিশ্বের লিথিয়ামের আশি শতাংশ সঞ্চয় করে রেখেছে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার। এখন যেমন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি পেট্রোল-ডিজেলের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে, ঠিক সেইভাবে চীনও ভবিষ্যতে ব্যাটারির বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। এই কারণেই চীনের লাদাখ ও কাশ্মীর চাই। ভারত যদি পাক- অধিকৃত কাশ্মীরকে নিজের সীমার মধ্যে নিয়ে আসতে পারে তাহলে এইসব সুবিধে ভারত পাবে। যদিও ভারত ইতিমধ্যেই লিথিয়ামের বিকল্প আবিষ্কার করে ফেলেছে। ভারতে অ্যালুমিনিয়াম প্লেট দিয়ে তৈরি হচ্ছে ব্যাটারি। তাতে ফলও মিলছে চমৎকার। কিন্তু তা হোক, পাক-অধিকৃত কাশ্মীর নিজের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারলে ভারত রেয়ার আর্থ মেটেরিয়াল বা লিথিয়াম রপ্তানি করে কোটি কোটি ডলার উপার্জন করতে পারবে, যা ভারতের ফোরেক্স রিজার্ভ অনেকটাই বাড়িয়ে দেবে। এছাড়া রয়েছে পর্যটন শিল্প।

পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে কিষেণগঙ্গার ধারে রয়েছে সারদাপীঠ। মুজফ্‌ফরাবাদ থেকে জায়গাটা ১৫০ কিলোমিটার দূরে। সারদাপীঠ কাশ্মীরি পণ্ডিতদের গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান। মেহবুবা মুফতি যখন কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি একবার পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন যে সারদাপীঠ তীর্থযাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হোক। তবে এই অনুরোধ ছিল নেহাতই রাজনীতির ঘোলাজলে ভোট ধরার অনুরোধ। কোনও পক্ষই কোনও পরিকল্পনা করেনি বা কোনও পদক্ষেপও করা হয়নি। পাক-অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলে লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরি পণ্ডিত সারদাপীঠে তীর্থযাত্রায় যাবেন। এরপর যা থাকবে তা হলো ভূস্বর্গের টান। যা উপেক্ষা করতে পারবেন না কেউই। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় জানা গেছে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করে পুরোপুরি পর্যটনের উপযোগী করে তুলতে পারলে জম্মু ও কাশ্মীর ও লাদাখ রাজস্ব আয়ের নিরিখে সুইজারল্যান্ডকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। এর পরের ভাবনা ভারত সরকারের। পাক-অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলে শুধু যে ভারতের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে তাই নয়, ভারতের কোষাগারও ফুলে ফেঁপে উঠবে।

এসব কথা পাকিস্তান জানে না, তা নয়। সেই কারণেই রাজনাথ সিংহ ও দত্তাত্রেয় হোসবলের বিবৃতিতে পাকিস্তানের হৃৎকম্প শুরু হয়ে গেছে। পাকিস্তানি মিডিয়ায় যার বহিঃপ্রকাশ সারা ভারত রোজ দেখছে। বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম সামরিক শক্তির সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার ক্ষমতা দেউলিয়া পাকিস্তানের নেই। তার ওপর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর ভারত এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম মোতায়েন করার পর সেই সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ। তার ভরসা একমাত্র চীন। কিন্তু চীনও বিশেষ স্বস্তিতে নেই। কারণ ভারত তার দ্বিতীয় এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমটি মোতায়েন করবে চীন সীমান্তে। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতের হাতে মার খাওয়া ছাড়াও পাকিস্তানের অন্য ভয়ও আছে। পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে ঝিলম নদীতে টারবাইন চালিয়ে যে বিদ্যুৎ তৈরি হয় তাতে আলোকিত হয় পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশ। পাকিস্তানের সেচের জলের উৎসও কাশ্মীর। এই অঞ্চল ভারতের নিয়ন্ত্রণে চলে এলে এসব বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তখন কী হবে? নানা চিন্তায় পাকিস্তান এখন দিশেহারা। এদিকে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের রাজনৈতিক নেতা আমজাদ জাফেরি এবং আরিফ জাকারিয়া ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। তাদের বক্তব্য, পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের ইচ্ছেও এরকমই। কারণ দিনে পনেরো-ষোলো ঘণ্টা লোডশেডিং এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অগ্নিমূল্য তারা আর মেনে নিতে পারছেন না। রাস্তায় রাস্তায় চলছে বিক্ষোভ। পুলিশ বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটাচ্ছে, গুলি চালাচ্ছে। মারা যাচ্ছে মানুষ।

ভারত কি এরপরও চুপ করে থাকবে?

সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকের জন্যই সন্ন্যাসী খুনে উদাসীন কংগ্রেস

সুকল্প চৌধুরী

অতি সম্প্রতি রাজস্থানে স্বামী বিজয়ানন্দ গিরি মহারাজের রসহ্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দেশের সাধু সমাজ ক্ষুব্ধ। হরিদ্বারের সিদ্ধকাম বেদান্ত আশ্রমের প্রধান বিশ্বাত্মানন্দ গিরি এই মৃত্যুকে খুন বলে দাবি করেছেন। তিনি এই মৃত্যুকে 'ষড়যন্ত্র করে আগুনে পুড়িয়ে পরিকল্পিত হত্যা' বলে আদালতে উপযুক্ত তদন্তের আবেদন করেছেন। যদিও রাজস্থান পুলিশের এডিজি (গোয়েন্দা) বেদপ্রকাশ শর্মা জানিয়েছেন খনি খননের কারণে পরিবেশ দূষণের প্রতিবাদে বিজয়ানন্দ আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু কংগ্রেস শাসিত রাজ্য রাজস্থান পুলিশের এই অতি সরলীকরণকে দেশের সাধু সমাজ মানতে নারাজ। সাধুদের বক্তব্য রাজস্থানের ভীলওয়াড়ার গ্রামে গরিব মানুষের বসতি উচ্ছেদ করে জমি দখল করে খনি খননের প্রতিবাদ করেছিলেন বিজয়ানন্দ। এই জন্যই খনি খনন ঠিকাদার সংস্থা আর জে মালেক কোম্পানির গুন্ডারা সর্বত্যাগী এই সন্ন্যাসীকে খুন করে। জানা গিয়েছে উচ্চ শিক্ষিত ও মেধাবী স্বামী বিজয়ানন্দ গিরি ওরফে বিজয় দাস দেশে ও বিদেশে অনেক বড়ো চাকরির সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু মানব সেবা ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। খুন বা আত্মহত্যার তত্ত্ব যাই হোক না কেন প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত হবে কিনা তার প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।

অগ্নিদগ্ধ স্বামী বিজয়ানন্দ গিরির শরীর।

এই প্রশ্ন আজকের নয়। এর আগে মোট ১২২৮ সাধু খুনের কোনও কিনারা এখনও হয়নি। সরকারি নথি হিসেবে এই খুন কোনও ঐতিহাসিক সময়ে হয়নি। সত্তরের দশক থেকে আজকের দিন পর্যন্ত এই হিসেবে পালঘাটের ঘটনাও আছে। বলার মতো বিষয় হলো পালঘাট বাদ দিলে এই ১২২৮টি ঘটনা ঘটেছে কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে। সকলেই জানেন, পালঘাটের সময় উদ্ধব ঠাকরে মুখ্যমন্ত্রী থাকলেও তিনি কংগ্রেসের অঙ্গুলিহেলনেই চলতেন।

একটু পেছনে তাকালে দেখা যাবে ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি অবিভক্ত উত্তর- প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কমলা- পতি ত্রিপাঠীর 'নির্দেশে' হরিদ্বারের কনখলে শ্রীশঙ্করাচার্য ভগবত আশ্রমের ১১ জন সাধুকে খুন করে গঙ্গায়

ভাসিয়ে দেওয়া হয়। আশ্রমের প্রধান গিরিরাজ সামন্তকে সকলের সামনে টুকরো করে কাটা হয়। দেশবাসীর কাছে এই ঘটনার খবর অনেক পরে আসে। পরে সাধুদের চাপে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তদন্ত কমিটি গঠন করেন। কিন্তু কোনও বিচার হয়নি। জানা গিয়েছে সেই সময়কার রাজ্যের প্রভাবশালী মন্ত্রী সত্যধন বিস্তের খামারবাড়ি যাওয়ার জন্য নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছিল। প্রস্তাবিত সড়ক এই আশ্রমের জন্য সোজাসুজি করা যাচ্ছিল না। তাই আশ্রম তুলে দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। প্রায় তিন বছর রাস্তার কাজ বন্ধ ছিল। কমলাপতি মুখ্যমন্ত্রী হয়েই রাস্তা তৈরির নির্দেশ দেন। তদন্ত রিপোর্ট অনুসারে জানা গিয়েছে ঘটনার দিন সকালে পুলিশের উপস্থিতিতে গুন্ডারা আশ্রমে তাণ্ডব চালায়। এলাহাবাদ হাইকোর্টে এখনও 'কনখল মার্ডার কেস' নামে বহু আলোচিত এই ঘটনার ট্রায়াল চলছে। মোট আটজনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছিল। এদের ভেতর সাতজনই এখন মৃত। একজন বয়েসের ভারে সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী।

সাধু খুনের বিচারের বাণী নীরবে কাঁদে। আরও একটি ঘটনা ঘটে কনখলের ঘটনার প্রায় দু'বছর পর। উত্তর প্রদেশের নাগলা সোতি থানা এলাকার কলারুয়া ধামে। হেমবতী নন্দন বহুগুণা এই সময় এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। মুসলমান অধ্যুষিত কলারুয়াতে মাতা শেরওয়ালি মন্দির তথা আশ্রমে বড়ো করে স্কন্দমাতা দেবীর পূজা করা হয়। এছাড়া একমাস ধরে বিশেষ পূজাপাঠ, হোম ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই আশ্রমে দেবীভক্ত গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীরাও থাকেন। প্রায় তিনশো বছরের পুরনো এই পূজায় বহু মানুষ অংশ নেন। ১৯৭২ সালে হঠাৎ করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এড়াতে খুব ছোটো করে পূজা করতে হবে। কোনও মেলা, হোম করা যাবে না। বাইরের কোনও ভক্ত পারবে না পূজায় অংশ নিতে। এই এলাকায় মুসলমান জনসংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে এই পূজা নিয়ে তাদের আপত্তি অনেকদিন ধরে ছিল। প্রতি বছরই পূজা বিরোধী মিছিল হয়, স্মারকলিপি জমা পড়ে কিন্তু কোনো অশান্তি হয়নি। স্বভাবতই ভক্তরা প্রশাসনের এই নির্দেশ মানেননি। ১৯৭২ সালের ১৬ অক্টোবর দুপুরে পূজার মহা হোমের সময় হামলা চালানো হয়। মোট ১৩ জন সন্ন্যাসী ও তিনজন ভক্তকে হত্যা করে হামলাকারীরা। ঘটনার সময় পূজামণ্ডপে উপস্থিত স্থানীয় গ্রামবাসীরা পরে পুলিশকে জানায় এলকার ইমাম মাওলানা গজর আলি আনসারি এই হামলার নেতৃত্ব দেয়। কিন্তু পুলিশ গ্রামবাসীদের অভিযোগের তদন্ত করেনি। এই ধরনের সাধু হত্যার ঘটনা স্বাধীন ভারতে অসংখ্যবার ঘটেছে। ২০১৯ সালে শিবসেনা সাংসদ ওয়াই এস সালওয়কর তথ্য জানার আইনে সংসদে আবেদন করে জেনেছিলেন, জম্মু, কাশ্মীর ও লাদাখ বাদে ১৯৪৭ সাল থেকে ২০১৯ পর্যন্ত সাধু হত্যার ঘটনা ঘটেছে ২১৯৮টি। সব মিলিয়ে মোট ৩৬৭৯ জন সাধু বা সন্ন্যাসীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের ভেতর ১৯ জন খ্রিস্টান, ২৬ জন শিখ (স্বর্ণ মন্দির ঘটনা বাদে), ১৩ জন বৌদ্ধ, ৫ জন জৈন এবং অন্যান্য ধর্মের ১৬ জন সাধু আছেন। তাঁরা প্রায় সবাই খুন হয়েছেন বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছে। এর ভেতর ২০৬৩ জন সাধু খুনের কোনও আইনি কিনারা এখনও হয়নি। সাধু হত্যার আইনি কিনারা না হওয়া ঘটনার ভেতর ১ জন বৌদ্ধ আছেন, বাকিরা সবাই সনাতন হিন্দু ধর্মের।

সাধু হত্যার অভিযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ

সর তন সে জুদা

কানহাইয়ালাল, উমেশ কোলহে, মুনিশ ভরদ্বাজ, অঙ্কিত ঝা, শানু পাণ্ডে ও নিশাঙ্ক রাঠোর। নূপুর শর্মাকে সমর্থন করার জন্য এরা সবাই জিহাদিদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন। বেশিরভাগই মারা গেছেন। নিশাঙ্ক রাঠোরের মৃতদেহ পাওয়া গেছে রেললাইনের ধারে। খুনের পর নিশাঙ্কের বাবা একটি মেসেজ পান। তাতে লেখা ছিল গুস্তাখ-ই-নবি কি এক হি সাজা, শর তন সে জুদা।' অর্থাৎ নবির অবমাননা করলে একটাই সাজা পেতে হবে। সেটা হলো, গলা কেটে খুন। অঙ্কিত ঝা-কে ভাগ্যবান বলতে হবে। কারণ ছ'বার ছুরি দিয়ে কোপানো সত্ত্বেও তিনি বেঁচে গেছেন। তার মায়ের অভিযোগ, নূপুর শর্মার নাম বাদ না দেওয়া পর্যন্ত বিহার পুলিশ এফআইআর নেয়নি। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয়, নূপুর শর্মাকে সমর্থন করার জন্য ভারতের ছ'জন মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত হলেও আন্তর্জাতিক মিডিয়া এই নিয়ে নীরব। অথচ মহম্মদ জুবের গ্রেপ্তার হবার আন্তর্জাতিক মিডিয়াকে অতিসক্রিয় হতে দেখা গেছে। জুবের একজন মুসলমান এবং একজন সাংবাদিক— মূলত এই দুটি বিষয় নিয়ে উচ্চকিত হয়েছে মিডিয়া। একটা বার্তা দেবার চেষ্টা হয়েছে যে জুবের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাংবাদিক বলেই হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারত তার ওপর অত্যাচার করছে। আসলে বাকস্বাধীনতার অধিকার হরণ করতে চায় মোদী সরকার। ব্যাপারটা এরকম, জুবেরের মত প্রকাশের অধিকার থাকা উচিত কিন্তু নূপুর শর্মার নয়। হিন্দু নূপুর যদি কোনও সত্যি কথা বলেন তাহলে তাঁকে খুনের হুমকি দেওয়া হবে। তাঁর রাজনৈতিক জীবন শেষ করে দেওয়া হবে। এমনকী তাঁকে যাঁরা সমর্থন করবেন তাঁদের গলা কেটে খুন করা হবে।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে মিডিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে। প্রশ্ন উঠছে আরও অনেক বিষয়ে। আর কতদিন মার খাবেন হিন্দুরা? আর কতদিন তাদের নিজভূমে পরবাসী হয়ে থাকতে হবে? সরকার ও প্রশাসন যত তাড়াতাড়ি এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজে ততই মঙ্গল। □

অংশে আসা যাক। বিগত ২০১৯ সাল পর্যন্ত এই ২১৯৮ জন সাধু হত্যার অথবা রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনার ১৭৬টি বাদে সবই ঘটেছে কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে। এই ১৭৬টি ঘটনা ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল, ত্রিপুরা, অসম, মেঘালয় ও ঝাড়খণ্ডে। এই রাজ্যগুলিতে বাম বা আঞ্চলিক দলগুলি ক্ষমতা দখল করেছিল। তবে অনেক ক্ষেত্রেই এই আঞ্চলিক দলের সঙ্গে জোটে ছিল কংগ্রেস। বিশ্লেষকদের মতে সাধু খুন বিশেষ করে হিন্দু সাধু খুনের কিনারা করতে কংগ্রেস কোনওদিনই আন্তরিক ভাবে আগ্রহ দেখায়নি।

সকলেই জানেন ১৯৪৫ সালের শেষ দিক থেকে মুসলমানরা পকিস্তানের দাবিতে আন্দোলনের নামে দেশজুড়ে সন্ত্রাস শুরু করে। কোনও সন্দেহ নেই ব্রিটিশরা এই সন্ত্রাসে মদত দিয়েছিল। পাশাপাশি ইতিহাস সাক্ষী, বামেরা ছাড়াও কংগ্রেসের একেবারে ওপরের তলা থেকে মুসলমানদের প্রায় প্রকাশ্যে সমর্থন জানানো হয়েছিল। স্বাধীনতার পর ভারতে থেকে যাওয়া বিশাল সংখ্যার মুসলমানদের ভোটে সমর্থন পেতে তাদের তোয়াজ করে চলেছে কংগ্রেস। এই তোয়াজের বহু উদাহরণ আছে। সর্বশেষ কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ বলেছিলেন, দেশের সম্পদে অগ্রাধিকার মুসলমানদের।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে কংগ্রেসের একটি পরিবার দেশ শাসন করে এসেছে। নেহরু বা গান্ধী (আসলে ফিরোজ খানের স্ত্রী বা পুত্র) পরিবারের বাইরে একমাত্র লালবাহাদুর শাস্ত্রী দেশের কথা ভেবেছেন। প্রথম থেকেই কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের তোয়াজ করে ভোটব্যাংক অটুট রাখা। সেই কারণে দেশের স্বার্থ উপেক্ষা করে মুসলমানদের স্বার্থ দেখেছেন কংগ্রেস নেতারা। খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, পুলিশ বা গোয়েন্দা তদন্তে বারবারই উঠে এসেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাধু হত্যার সঙ্গে মুসলমান নেতা, ইমাম, মুসলমান মালিকানাধীন বিভিন্ন সংস্থার যোগসূত্র আছে। কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে মূলত এই ঘটনার যোগাযোগ অনেক বেশি। অভিযোগ বা প্রমাণ থাকলেও কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে সাধু হত্যার সঙ্গে যুক্ত কোনও মুসলমান ব্যক্তির সাজা এখনো হয়নি। এইসব হত্যার সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে প্রচুর মুসলমান অপরাধী ধরা পড়েছে কিন্তু তাদের অনেকেই প্রমাণাভাবে খালাস পেয়ে গিয়েছে অথবা ট্রায়াল চলছে। মনে রাখতে হবে যে, কোনও অপরাধের কেস সাজায় পুলিশ। তবে কংগ্রেস, বাম, তৃণমূল পরিচালিত রাজ্যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের অনুগত হয়ে চলে পুলিশ। সকলেই দেখছেন, উত্তরপ্রদেশে পুলিশ আইন মেনে চলে আর পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল বা বাম জামানায় পুলিশ চলে শাসক দলের নির্দেশে। তারা হয়ে পড়ে দলদাস। তাই আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীদের খুনে অভিযুক্ত মুসলমানরা ছাড়া পায়। এই রাজ্যে এখন তো আইনের শাসন নেই, আছে শাসকের আইন।

ভারতে প্রথম থেকেই আধ্যাত্মিক, জাগতিক বা জীবনের চলার পথ দেখিয়েছেন সাধু-সন্ন্যাসীরা। ধর্মের পথে বা অনুশাসনের পথে থেকেছে ভারত। যতবার বিচ্যুত হয়েছে ভারতবাসী তখনই মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে পথ দেখাতে।

কংগ্রেস কখনই এই আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক এবং ভারতীয় শিক্ষায় বিশ্বাসী নয়। জওহরলাল নেহরু ব্রিটিশ নারীসঙ্গ পছন্দ করতেন বলে বিভিন্ন লেখায় উল্লেখ আছে। তাই তিনি ব্রিটিশ রমণীর দেখানো পথে চলেছেন। ইন্দিরার বিয়ে হয়েছিল আফগান মুসলমান ফিরোজ খানের সঙ্গে। তিনি দেশের জনগণকে ভুল বোঝাতে গান্ধী পদবি ব্যবহার করতেন। রাজীব বা তাঁর পরবর্তী কংগ্রেস ইতালির নির্দেশে চলে। ফলে ভারতীয় সাধু-সন্ন্যাসীদের দেখানো পথে চলেনি কংগ্রেস। নীতিভ্রষ্ট কংগ্রেস পাশে পেয়েছে মানবতা বিরোধী বামেদের। প্রশ্ন আসে, এখন তো কেন্দ্রে এনডিএ সরকার তবুও কেন সাধু খুনের ঘটনা ঘটছে? মনে রাখতে হবে, আইন-শৃঙ্খলা রাজ্যের হাতে। তাই বিজেপি পরিচালিত রাজ্যে এমন ভয়াবহ ঘটনা ঘটে না। □

কর্ণাটকে বিজেপি নেতা খুন

হিন্দুরা কি বিপন্ন? কর্ণাটকের দক্ষিণ কান্নাড়ার বেলারিতে বিজেপির তরুণ নেতা প্রবীণ নেত্তারু খুন হবার পর এই প্রশ্ন রাজনীতিক মহলে উঠে এসেছে। প্রশ্নটি বা, বলা ভালো, এই আশঙ্কার ডালপালা ছড়িয়ে পড়ছে। তার কারণ, এখনও পর্যন্ত এই খুনের মামলায় যে-পনেরো জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে তারা সকলেই পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়ার (পিএফআই) সঙ্গে যুক্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই পিএফআই ২০৪৭-র মধ্যে ভারতকে ইসলামিক দেশ বানানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। দক্ষিণ কান্নাড়ার পুলিশ সুপার জানিয়েছেন এখনও পর্যন্ত এই খুনের মামলায় পনেরো জনকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এবং দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। প্রবীণ নেত্তারু বিজেপি যুব মোর্চার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। সম্প্রতি রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার সময় তিনজন সশস্ত্র দুষ্কৃতী তাঁকে আক্রমণ করে। তারা কেরলে নথিভুক্ত বাইকে চেপে এসেছিল। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আঘাত করার ফলে প্রবীণ ঘটনাস্থলেই মারা যান। হত্যাকারীদের সঙ্গে কেরলের যোগাযোগের রহস্য পুলিশ এখন খতিয়ে দেখছে। কেরল ইসলামিক উগ্রপন্থীদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। কেন্দ্রও বহুবার এই কারণে কেরলের বাম সরকারকে সতর্ক করেছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। মাঝে মাঝেই কেরলের অসংখ্য যুবক প্রতি বছর আইসিসের ট্রেনিং নেওয়ার জন্য পাকিস্তানে যায়। সুতরাং পিএফআই কেরলেই তাদের আসল ঘাঁটি গেড়েছে কিনা সেটা জানা খুবই দরকার। কান টানলে বড়ো মাথার খোঁজ পাওয়া যাবে বলে পুলিশের বিশ্বাস। প্রবীণের মা অবিলম্বে খুনিদের গ্রেপ্তারি এবং ফাঁসির দাবি করেছেন।

ভারতীয় মুদ্রার অবমূল্যায়নের হার বেশিরভাগ দেশের চেয়ে কম

আনন্দ মোহন দাস

বিশ্ব অর্থনীতি আজ এক ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন। বহু দেশের অর্থনীতি আজ এক ডামাডোল অবস্থার মধ্যে চলেছে। মন্দা অর্থনীতিতে সরবরাহ শৃঙ্খল (সাপ্লাই চেইন) নষ্ট হওয়ায় বেশ কিছু দেশ আজ খাদ্যসংকটের মুখোমুখি। এর জন্য দায়ী মূলত কোভিড মহামারী ও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ। কিছু দেশের অর্থনীতি একেবারে বিপর্যস্ত। তারা মূলত অন্য দেশের সাহায্যের উপরই নির্ভরশীল। অনেক দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার তুঙ্গে। গত জুন মাসের তথ্য অনুযায়ী আমেরিকার মুদ্রাস্ফীতির হার গত চার দশকের সর্বোচ্চ, ৯.০১ শতাংশ। ব্রিটেনেও বিগত চল্লিশ বছরের সর্বোচ্চ মূল্য বৃদ্ধির হার ৯.৪০ শতাংশ। সে তুলনায় ভারতের মূল্যবৃদ্ধির হার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে, মাত্র ৭.০১ শতাংশ। বর্তমান পরিস্থিতিতে আবার ডলারের নিরিখে অনেক দেশের মুদ্রার অবমূল্যায়নে বেশিরভাগ দেশকে এক নতুন সংকটে ফেলেছে।

বিশ্বায়নের যুগে ভারত তার ব্যতিক্রম না হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতের অবস্থান তুলনামূলক ভাবে ভালো জায়গায় রয়েছে বলে আর্থিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত। বর্তমানে আমাদের দেশে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা ও কিছু সরকার বিরোধী অর্থনীতিবিদ গেল গেল রব তুলেছেন। এমনকী শ্রীলঙ্কার বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা টানতে গিয়ে অন্যায় ভাবে ভারতের আর্থিক অবস্থার অবমূল্যায়ন করেছেন। কিন্তু বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের অনেকে বলেছেন ভারতের অর্থনীতিকে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে তুলনা করা মোদী বিরোধিতার নির্লজ্জ প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। নীচের পরিসংখ্যান দেখলে বোঝা যায় ভারতীয় মুদ্রার অবমূল্যায়নের শতকরা হার বিশ্বের অনেক দেশের মুদ্রার থেকে তুলনামূলক ভালো জায়গায় রয়েছে।

১. ভারত ৭.৪৯ শতাংশ।

২. ইউরোপ ১৩.৪২ শতাংশ।

৩. পাকিস্তান ১৯ শতাংশ।

৪. জাপানি ইয়েন ২১ শতাংশ।

৫. পাউন্ড স্টার্লিং (ইউকে) ১৪.৫ শতাংশ।

৬. অস্ট্রেলিয়ান ডলার ৮.০৪ শতাংশ।

৭. নিউজিল্যান্ড ১১.৭২ শতাংশ।

শ্রীলঙ্কার কথা তো উল্লেখ করার অবস্থায় নেই। তারা নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করেছে। সেজন্য সম্প্রতি ভারত সরকারের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা ভি অনন্ত নাগেশ্বরন যথার্থ বলেছেন, ডলারের নিরিখে টাকার চেয়ে অনেক বেশি অবমূল্যায়ন ঘটেছে জাপানি ইয়েন, ইউরো, সুইস ফ্রাঙ্ক, ব্রিটিশ পাউন্ডের।

যারা নরেন্দ্র মোদীকে দিবারাত্র এ ব্যাপারে গালাগালি দিচ্ছেন তারা ইউপিএ-২ এবং এনডিএ-১ আমলের বিগত পাঁচ বছরের তুলনামূলক পরিসংখ্যানে ভারতীয় মুদ্রার পতনের শতকরা গড় হার দেখলে বুঝতে পারবেন এনডিএ আমলে টাকার পতনের শতকরা হার অনেক কম।

২০০৯ সালে মনমোহন সিংহ সরকারের আমলে ডলারের নিরিখে টাকার গড়ে দাম ছিল ৪৫.৯ এবং ২০১৪ সালে গড়ে দাম ছিল ৬০.৫০। অর্থাৎ পাঁচ বছরে টাকার গড়ে পতনের হার ছিল ৩১.৭৭ শতাংশ। কিন্তু

নরেন্দ্র মোদীর শাসনে ২০১৪ থেকে ২০১৯ সালে গড়ে টাকার দাম ছিল ৬৯.৯২। অর্থাৎ গড়ে টাকার দাম কমেছিল ১৫.৫৭ শতাংশ। সুতরাং বিরোধীদের চিৎকার যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা সহজেই অনুমেয়।

ডলারকে বলা হয় মাস্টার কারেন্সি এবং ডলার এমন একটি বিনিময় মুদ্রা যা সব দেশের কাছে গ্রহণযোগ্য। রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধের পরিস্থিতিতে বিশ্বের বাজারে ডলারের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউরোপিয়ান দেশগুলি ও বিশেষ ভাবে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলির উপর রাশিয়ান পণ্যের নিষেধাজ্ঞার ফলে অনেক জিনিস বিশ্বের বাজার থেকে আমদানি করতে গিয়ে দেশগুলির ডলারের প্রয়োজন বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্য স্বাভাবিক ভাবেই ডলারের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আর্থিক বিশেষজ্ঞরা বর্তমান ভারতীয় মুদ্রার (রুপি) অবমূল্যায়নের কারণ হিসেবে নিম্ন লিখিত কয়েকটি বিষয়কে দায়ী করেছেন।

১. বিশ্বের আর্থিক মন্দা।

২. পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধি বিশেষভাবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর। যার ফলে আমদানির খরচ বৃদ্ধি। যেহেতু ভারতের ৮৫ শতাংশ পেট্রোলিয়াম জাত পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়, তাই ডলারের দাম বৃদ্ধিতে আমদানি খরচ স্বাভাবিক ভাবেই বৃদ্ধি পাবে।

৩. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ডাল, ভোজ্যতেল-সহ বেশ কিছু পণ্য আমদানি করতে বাধ্য হয়েছে। যার ফলে আমদানি খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় ডলারের খরচ বেশি হয়েছে এবং ডলারের বহির্গমন বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক ভাণ্ডার সংকুচিত হয়েছে।

৪. আমেরিকার মুদ্রাস্ফীতির বিগত চল্লিশ বছরের সর্বোচ্চ ৯.০১ শতাংশ বৃদ্ধির ফলে সেদেশের কেন্দ্রীয় আর্থিক সংস্থা ফেড জুন মাস পর্যন্ত সুদের হার ১৫০ বেসিস পয়েন্ট অর্থাৎ ১.৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে এবং আর্থিক বিশেষজ্ঞরা আরও দাবি করেছেন আগামীদিনে ফেড শীঘ্র আরও ০.৭৫ শতাংশ সুদের হার বাড়াতে পারে। তার ফলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ঝুঁকিপূর্ণ শেয়ার বাজার থেকে তাদের বিনিয়োগ তুলে নিয়ে ঝুঁকিহীন বন্ডে, ঋণপত্রে বা বেশি সুদে বিনিয়োগ করে মন্দা আর্থিক বাজারে নিশ্চিন্ত হতে চাইছে। সুতরাং শেয়ার বাজারে বিদেশি বিনিয়োগ কমছে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীরা শেয়ার বাজার থেকে বিনিয়োগ প্রত্যাহার করে বিদেশে তথা আমেরিকায় বিনিয়োগ করছে। ডলারের নিরিখে টাকার দাম কমছে। ২০২২-এ ইতিমধ্যেই বিদেশি বিনিয়োগকারীরা শেয়ারবাজার থেকে এক লক্ষ একাশি হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ উঠিয়ে নিয়েছে।

৫. অনেক কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে উৎপাদন খরচও বাড়বে। যার ফলে অনেক জিনিসের দাম বৃদ্ধি পাবে বলেই বিশেষজ্ঞদের অভিমত। সেজন্য নরেন্দ্র মোদীর আত্মনির্ভরশীল ভারতের প্রয়োজনীয়তা আজকের দিনে বেশি করে অনুভূত হচ্ছে। মোদী সরকার যে এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে সচেতন, বিভিন্ন সময়ে ইতিবাচক সরকারি পদক্ষেপই তার প্রমাণ।

৬. আমদানি খরচের বৃদ্ধির জন্য কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ঘাটতির পরিমাণ বাড়বে। অর্থাৎ সহজে বলা যায় যে কোনো দেশের আমদানি খরচ যদি রপ্তানি খরচের বেশি হয় তখনই ঘাটতি দেখা দেয়। স্বাভাবিক ভাবেই টাকার অবমূল্যায়নে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ঘাটতি বাড়বে। এখন উল্লেখ্য, রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া টাকার অবমূল্যায়ন রুখতে ইতিমধ্যেই নিম্নোক্ত বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা আগামীদিনে টাকার দামের পতন রুখতে সহায়তা করবে বলেই আর্থিক মহল মনে করছেন।

১. অনাবাসী ভারতীয়দের দেশে বিদেশি মুদ্রা (ডলার) পাঠাতে উৎসাহ দান।

২. ডলারের মাধ্যমে আমদানিতে রাশ টানতে সোনা-সহ বেশকিছু পণ্যের শুল্কের হার বৃদ্ধি।

৩. শিল্প সংস্থাগুলির বৈদেশিক বাণিজ্য ঋণের ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি।

৪. ভারতীয় ঋণপত্রে বিদেশি লগ্নিকারী সংস্থাগুলির লগ্নির শর্ত শিথিল।

পরিশেষে আর্থিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, ভারতের টাকার অবমূল্যায়নের হার বিশ্বের অনেক দেশের থেকে কম এবং বিশ্ব আর্থিক মন্দা কাটিয়ে ভারতীয় টাকার দাম যে আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই, এমনটাই আর্থিক বিশেষজ্ঞরা আশা প্রকাশ করেছেন। □

ভগবান বাঙ্গালিকে সুবুদ্ধি দেবেন এটাই কাম্য

রামানুজ গোস্বামী

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক আকাশছোঁয়া দুর্নীতি এবং তার অনিবার্য পরিণতি আজ সারা ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের দরবারে উন্মোচিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই ভয়ংকর দুর্নীতি আজ প্রমাণ করেছে যে, এই

রাজ্য-সরকার সম্পূর্ণ ভাবেই দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বেচ্ছাচারী। তৃণমূলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ মহাসচিব ও রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী (বর্তমানে শিল্পমন্ত্রী) পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে সম্প্রতি ইডি গ্রেপ্তার করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি চাকরি পেতে হলে এই রাজ্যে মোটা অঙ্কের টাকা ঘুষ দিতে হয়— এটা একটা সর্বজনবিদিত সত্যে পরিণত হয়েছিল অনেক আগেই। সাম্প্রতিককালে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর এই গ্রেপ্তারিতে তা আজ প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বে পরিণত হয়েছে। এটা ঠিকই যে, ২০১১ সালে তৃণমূল এই রজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যে সরকারি চাকরি প্রসঙ্গে দুর্নীতি হয়ে উঠে লাগামছাড়া। লক্ষ লক্ষ চাকরিপ্রার্থীর বিক্ষোভ-প্রদর্শন, অনশন, আদালতের দ্বারস্থ হওয়া থেকে শুরু করে কোর্টের নির্দেশে মন্ত্রীকন্যা ও আরও বহু কর্মরত ব্যক্তির চাকরি চলে যাওয়া, সিবিআই-ইডির তদন্ত সবই আজ এই রাজ্যের দৈন্যকেই প্রকাশ করে ফেলেছে।

আসলে এই রাজ্য-সরকার পরিচালনা করে যে রাজনৈতিক দল, তার থেকে এই প্রকার কর্মধারাই আশা করা যায়। এটা যে সত্য তার প্রমাণ হলো, উচ্চশিক্ষিত বা মাঝারি শিক্ষিত নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের একটা স্বপ্ন থাকত স্কুলের শিক্ষক হওয়ার জন্য। সে এসএসসি বা প্রাইমারি যাই হোক না কেন, পুরোটাই চলে গিয়েছে দুর্নীতির কবলে। সেই দুর্নীতি এতটাই ভয়াবহ যে, কখনও পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ না দিয়েই হয়ে যায় চাকরি। প্যানেলে নাম না থাকা সত্ত্বেও মোটা বেতনের সরকারি চাকরি মিলে যায় অনায়াসেই। কখনও-বা বেআইনি ভাবে রাতের অন্ধকারে মেরিট লিস্টই উধাও হয়ে যায় ওয়েবসাইট থেকে। আবার কারও ক্ষেত্রে নম্বর যায় কমে, কারও ক্ষেত্রে নম্বর যায় বেড়ে। আসলে ২০১১ সাল থেকে এই সবই এই রাজ্যের একেবারে চেনা ছবি। এই রাজ্য-সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত চাকুরিপ্রার্থীদের তিরস্কারও জুটেছে বারে বারে। কখনও গলা ধাক্কা, কখনও পুলিশের মার বা লাঠিপেটা, কখনও গ্রেপ্তারি ও হাজতবাস।

এই সময়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও তার ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের একের পর এক বাড়ি তথা ফ্ল্যাটে ইডি হানা দিয়েছে ও দিচ্ছে। উদ্ধার হচ্ছে কোটি কোটি টাকা, স্বর্ণালংকার, রৌপ্যমুদ্রা, ডলার। এই বিপুল অর্থের অংশবিশেষ বাংলাদেশ বা অন্যত্র পাচার হয়ে গিয়েও থাকতে পারে এমনটাও আশঙ্কা করা হচ্ছে। আসলে এইটাই তো তৃণমূল সরকারের আসল চরিত্র। সাধারণ মানুষের করের টাকায় বিপুল বিলাসিতা করাই এদের লক্ষ্য। ব্যাপারটা একেবারে হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় নিজেদের ইমেজ ঠিক রাখতে ও ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে এখন তৃণমূল পার্থকে লোকদেখানো সাসপেন্ড করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজ বুঝতে পারছে যে আদতে তৃণমূল কংগ্রেস দলটা ঠিক কেমন প্রকৃতির! এটা আজ এই সময়ে দাঁড়িয়ে কোনো ভাবেই অস্বীকার করা যাবে না যে, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত কোনো কেউই আজ আর সন্দেহের বাইরে নয়। দীর্ঘ ১০/১১ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতী বঞ্চিত হয়েছে এই চরম দুর্নীতিগ্রস্ত দলটির কারণে। এই ঘটনা যে শুধুমাত্র শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরির ক্ষেত্রে হয়েছে, এমনটা তো নয়। পুলিশের চাকরি, গ্রুপ-ডি, নার্সের চাকরি, সরকারি চিকিৎসকের চাকরি সর্বত্রই তৃণমূল তার দুর্নীতির পরিচয় দিয়েছে। কোটি কোটি টাকার চূড়ায় বসে আছে তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা আর সাধারণ বেকার যুবক-যুবতীদের দিন কাটছে রাস্তায় বসে, ধরনামঞ্চে। সরকারি কর্মীরা ডিএ পায় না, কিন্তু কুকুরের ডায়ালিসিস হয় এই রাজ্যে, কুকুরের জন্য পৃথক ফ্ল্যাটও হয়ে যায়। এটাই বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের চিত্র।

কিন্তু এই ভাবে আর কতদিন? সিন্ডিকেট, কাটমানি, তোলাবাজি এইসবই আজ পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের নিদর্শন।

ভগবান এই রাজ্যের বাঙ্গালিদের, বিশেষত নবীন প্রজন্মকে সুবুদ্ধি ও বিবেচনা প্রদান করুন, এটাই কাম্য। □

কার টাকা, যেতো কোথায়?

পার্থ-অর্পিতা গ্রেপ্তার। পার্থ ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার করা হয় প্রায় ২২ কোটি। ৭৯ লক্ষ টাকার সোনার অলংকার ও ৫৪ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা। টাকাগুলি ছিল ২০০০ ও ৫০০ টাকার নোটে। আর বেশ কিছু টাকা পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের খামে মোড়া। এই টাকার ব্যাপারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইডির অফিসারেরা ওই টাকার উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেও পার্থ-অর্পিতা কেউই উত্তর দেয়নি। ইডি আধিকারিকদের সঙ্গে সামান্যতম সহযোগিতা করেনি উভয়ের কেউই। তাই তাদের গ্রেপ্তার। এই পত্র লিখার সময় পার্থ ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায় আছেন সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির লকআপে। আর এই মুহূর্তে বিদ্যালয়ের বঞ্চিত চাকুরির প্রার্থীরা ৪৯৬ দিন রাস্তায় বসে। তৃণমূল দল পার্থকে মন্ত্রী হিসেবে পদে বহাল রেখেছে। দল বলেছে দোষ প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে দল ও সরকার ব্যবস্থা নেবে। জানিনা দোষী প্রমাণিত হলে দলের ও সরকারের কি কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার কিছু থাকে কি না? কুনাল-ববিরা আজ বলেছে পার্থ যদি ওয়াশিং মেশিনে যেত তা হলে ইডি কি সক্রিয় হতো? তারা ইডিকে তাড়াতাড়ি জানাতে বলেছে টাকার আসল উৎসটা। অবশ্যই সারা দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষরাও তা জানতে আগ্রহী।

এখানেই কুনাল-ববি হাকিমদের আমার প্রশ্ন, আজ যে টাকা অর্পিতার বাড়ি থেকে ইডি ১৪টি ট্রাঙ্কে ও সোনার অলংকার নিয়ে আরও ১টি ট্রাঙ্কে নিয়ে গেল তা ওরা জানে না কার এই টাকা বা অলংকার। কিন্তু দল হিসেবে আপনারা কি জানেন না পার্থ ৪৫ কোটি টাকা নগদে তার স্কুলের জন্য জমি কিনেছে? জানলে কী ব্যবস্থা নিয়েছেন? অথচ ২০১৯ সালে মুখ্যমন্ত্রী রাস্তায় বসে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে গিয়ে বলেছিলেন তাদের চাকরি ফিরিয়ে দেবে। তিনি কি তা করেছেন? দুঃখ আমাদের সেটাই। তিনি শুধু আশ্বাস দিয়েছেন মাত্র।

ইডি জানিয়েছে শান্তিনিকেতনের দুটি বৃহৎ অট্টালিকার দলিলের ফোটোকপি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে পাওয়া গেছে। উদ্ধার হওয়া টাকার পাহাড় ও বিপুল সম্পত্তির তালিকা দেখে বাঙ্গালি হিসেবে আমাদের লজ্জাবোধ হচ্ছে। আমরা চাই অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। সঙ্গে বঞ্চিত সমস্ত চাকরি প্রার্থীদের অবিলম্বে নিয়োগ।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

ভারতের জনজাতি সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যাসাগরই প্রথমব্যক্তি যিনি তাঁর শেষজীবনের মূল্যবান বছরগুলি বিহারের জনজাতিদের মধ্যে অতিবাহিত করেন এবং তাদের জীবনের মানোন্নয়নের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও বিশ্বভারতী নির্মাণের পর প্রতিবছর যখন পৌষমেলা, হলকর্ষণ উৎসব ইত্যাদি করতেন, সেখানে জনজাতি সংস্কৃতি উপস্থাপনের সুযোগ রেখেছিলেন। এছাড়া তিনি কুটির স্থাপনের মাধ্যমে যেসব কর্মপ্রকল্প রচনা করেছিলেন, সেখানেও জনজাতিদের লোকশিল্প শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। ভারতীয় জনজাতিরা প্রধানত সাঁওতাল, কোল, ভিল, মুণ্ডা, নাগা ও খাসিয়া সম্প্রদায়ের। তাঁরা প্রধানত নগরজীবন বিবর্জিত অরণ্যনিবাসী। নিরুপদ্রব অরণ্যজীবনই তাদের অবলম্বন, প্রাণের পুষ্টি ও ঐতিহ্য। অরণ্যের ফলমূল, জীবজন্তু শিকার, চাষবাস, কেন্দুপাতা সংগ্রহ ও বিপণনই তাদের জীবনযাপনের উপাচার। কখনো কখনো তারা বনের জীবজন্তু শিকার করেও ভোজের আয়োজন করেন। তারা বোঙা বা শিবের উপাসক। খুবই সাধারণ জীবনে তারা অভ্যস্ত। তাদের নেশার উপাদান প্রধানত মহুয়া, হাড়িয়া। জনজাতি মহিলারা পুরুষের সাহায্য ছাড়াই যাবতীয় সাংসারিক দায়দায়িত্ব নিজেরাই পরিচালনা করার চেষ্টা করে। মুসলমান ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জনজাতিদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ইতিহাস সকলের সুপরিচিত।

স্বাধীনতার পর জনজাতি ও তপশিলিভুক্ত বর্ণসমূহের উন্নয়নের জন্য চাকরিতে সংরক্ষণ, শিক্ষাভাতা ও অন্যান্য সুযোগের ব্যবস্থা করা হয়। ওইসব সরকারি সুবিধা পেয়ে ভারতীয় জনজাতি ও তপশিলিভুক্ত নারী-পুরুষ প্রায় উন্নত বর্ণের সমকক্ষ হয়ে ওঠেন। তবে নীতিভ্রষ্ট ও পরিত্যক্ত নকশাল রাজনীতির খপ্পরে পড়ে তারা অনেকেই দিকভ্রষ্ট হয়েছেন কখনো কখনো। তবে এখন তারা বেশিরভাগই আছেন মূলস্রোতে। তাদের মধ্যে পথভ্রষ্ট করার নকশালি প্রয়াস আপাতত ব্যর্থ। তবে ছত্তিশগড় ইত্যাদি জায়গায় তারা কোথাও কোথাও এখনো শক্তিশালী আছে এবং শান্ত অরণ্যকে নকশালরা বিশৃঙ্খল করে তুলছে। জনজাতিদের জীবনে নামে বিপর্যয়।

এইসব সমস্যা থাকলেও বিভিন্ন সরকারি কাজে জনজাতিরা কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন এবং তারই স্বীকৃতিস্বরূপ ও ভারতীয় জীবনে তাদের অস্তিত্বকে মান্যতা দিতেই ভারতীয় স্বাধীনতার অমৃতমহোৎসবের বছরে ভারত সরকার দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি পদে অভিসিক্ত হবার সুযোগ দিয়ে মহানুভবতার পরিচয় রেখেছে। বর্তমান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ১৯৫৮ সালের জুন মাসে ময়ূরভঞ্জের রাইরাঙ্গপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তারা বাবা এবং ঠাকুরদা পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন এবং ওইসূত্রে দ্রৌপদী মুর্মু গ্রামীণ রাজনীতির অভিজ্ঞতা লাভ করেন। শিক্ষাগত যোগ্যতায় দ্রৌপদী মুর্মু কলাবিভাগের স্নাতক। সরকারি চাকরি করার পর ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্বভার সামলেছেন বেশ কয়েক বছর। তারপর রাষ্ট্রপতি কোবিন্দের স্থলাভিসিক্ত হলেন। নিঃসন্দেহে এটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তাকে শুভেচ্ছা জানাই।

—বরুণ দাশ,
বিজয়ভিলা, বসিরহাট, ২৪ পরগনা।

দুর্নীতিতে অভিযুক্ত কেন পদে বহাল?

তৃণমূল নেত্রীকে দলের কর্মীরা এতদিন সততার প্রতীক হিসেবে বলে আসছিলেন। অবশ্য এখন আর বলেন না। অতীতে নিজেকে সততার পরাকাষ্ঠা হিসেবে তুলে ধরতে এনডিএ জমানায় জর্জ ফার্নান্ডেজের নাম কফিন কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে যাওয়ায় এনডিএ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন যে নেত্রী তিনি কেন তাঁরই মন্ত্রীসভার সদস্য যিনি এসএসসি-র দুর্নীতি, আর্থিক তছরূপের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন তবে কেন তাকে সব সরকারি পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে না? কেন এই দ্বিচারিতা? অনেকে বলছেন এটা নাটক। কারণ ওই সময়ে এটা দরকার ছিল। কারণ রাজ্য বাসিন্দাদের কাছে নিজেকে সততার প্রতীক হিসেবে পরিচিত করার তাগিদ ছিল। এখন যখন পুরো দলটা দুর্নীতিগ্রস্ত তখন আর কাকে বাদ দেবেন আর কাকেই-বা রাখবেন। ছোটো, মেজ, বড়ো সব ধরনের নেতা দুর্নীতিতে যুক্ত। তাড়াতে গেলে ঠগ বাছতে গা উজাড় হয়ে যাবে, দলটি উঠে যাবে। এখন রাজ্যে তৃণমূলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি। হাওয়ালা ডায়েরিতে নাম থাকায় আদবানী, উমা ভারতীর মতো নেতা-নেত্রী পদত্যাগ করেছিলেন, আবার আদালতের রায়ে পরিশ্রুত হয়ে ক্ষমতায় ফেরেন আদবানি, তবে বিজেপি উমা ভারতীকে পদে ফেরায়নি।

একের পর এক ভুল করছেন তৃণমূল নেত্রী। এসএসসি-র মামলা আদালত পর্যন্ত গড়াতে দেওয়া উচিত ছিল না। অনেকে বলছে এই দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে দলের শীর্ষ পর্যন্ত। কাজেই ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। এত টাকা লুট হয়েছে তা আর ফেরত দেবার উপায় ছিল না। প্রশ্ন উঠেছে, সাপ যখন মাথায় কামড়ায় তখন ওঝা তাগা বাঁধবে কোথায়? তাই নেত্রীর উচিত তাঁর দলের ভাবমূর্তি যতটুকু আছে সেটা রক্ষা করতে অবিলম্বে পার্থবাবুকে দায়িত্বমুক্ত করুন। পার্থ আবার ফিরবেন আদালতের রায়ে পরিশ্রুত হয়ে যেমন হয়েছে আদবানির ক্ষেত্রে। ভাববেন না একুশের জনসমর্থন চিরস্থায়ী। বামেরা চৌত্রিশ বছর জগদ্দল পাথরের মতো বসেছিল এ রাজ্যে। তাদেরও সরে যেতে হয়েছে। যদি একসময় সরে যেতে হয় মাথা উঁচু করে সরুন। মনে রাখবেন গণতন্ত্রে শেষ কথা বলে জনতাই।

—তারক সাহা,
হিন্দমোটর, হুগলি।

অভিনন্দন দ্রৌপদী মুর্মু

ভারতের প্রথম জনজাতি সম্প্রদায়ের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে অভিনন্দন জানাই। টানটান উত্তেজনায় ভোটগণনার রায়ের মধ্যে দিয়ে ভারত পেল প্রথম জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত একজন সৎ, কর্মনিষ্ঠ শিক্ষিতা মহিলা রাষ্ট্রপতিকে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিপুল সংখ্যক বিরোধী সাংসদ ও বিধায়ক দ্রৌপদী মুর্মুকে সমর্থন করেছেন। বিরোধী রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী যশবন্ত সিনহা অনেক কম ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। বিপুল সমর্থন পেয়ে নবনির্বাচিত জনজাতি মহিলা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ভারতবর্ষের গৌরব। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে বাম পরিচালিত কেরল রাজ্যে। সেখানেও সমর্থন পেয়ে একটি ভোট নিজের দিকে টানতে সমর্থ হয়েছেন দ্রৌপদী মুর্মু। কেরল বাদ দিয়ে বাকি সব রাজ্যে ব্যাপক সংখ্যক জনপ্রতিনিধিরা এনডিএ প্রার্থীকে সমর্থন করেছেন। অসমে ২৫ জন বিরোধী বিধায়ক ভোট দিয়েছেন। মহারাষ্ট্রে ১৮১ জন বিধায়ক নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে সমর্থন করেছেন। অপরদিকে বিরোধী প্রার্থী যশবন্ত সিনহা অন্ধ্রপ্রদেশ, সিকিম ও নাগাল্যান্ড থেকে একজনেরও সমর্থন পাননি।

—সঞ্জয় ব্যানার্জি,
চুঁচুড়া, ব্যাপাক রোড, হুগলি।

মহানগরীর দুঃখ কথা

২১ জুলাইয়ের সাক্ষী থাকে মহানগরীর মহামিছিল। একি মহাভিড়! শুধু কালো কালো মাথা। এ শহর কখনো কোভিড নির্জনতার সাক্ষী ছিল এখন ভাবতেই পারি না। শহিদ দিবসেও মহাআনন্দের মহামিছিল দেখি। মিছিলের শহরে মিছিল হবে না? মিছিলে, মিছিলে হরতালে কলকাতা আছে সেই কলকাতাতেই। তখন দুঃস্বপ্নের নগরী হয়ে ওঠে। মৃত শহর বলে কেউ গালি দেয়। আজ এই মিছিল দিবসে কোথাও মৃতদের জন্যে শোক প্রকাশ দেখি না। শহিদমঞ্চে শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন— নৈব নৈব চ। নেত্রী গর্জে উঠে অশ্বমেধ ঘোড়ার বিজয় রথ ছুটিয়ে দেন কলকাতা থেকে দিল্লি। চারদিকে শুধু আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। আবেগে, উচ্ছ্বাসে, ঢোলের বাজনার সঙ্গে নাচে, গানে তারা উদ্দাম, উত্তাল। রোদে ঘামে জলে পায়ে পায়ে মিছিল এগিয়ে চলে ধর্মতলার মঞ্চের দিকে। আনন্দের ফোয়ারায়, হাসি ঠাট্টায় রাজপথের দু'ধারে কত খাবারের আয়োজন।

সত্যি বলতে কী, এমন আনন্দ নগরী বিশ্বে আর কোথাও নেই। এমন প্রাণের, এতো উচ্ছ্বাস, এতো আনন্দের শহরের জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু কখনো ক্লান্তি আসে; ছন্দ পতন ঘটে মিটিং-মিছিলের ভিড়ে, হৈ-হট্টগোলে। নগরবাসীর সঙ্গে আমরা অফিস যাত্রীরা আজ ফাঁকা রাস্তা পেয়ে সানন্দে হাঁটা দিবস পালন করি। এছাড়া উপায় কী? যানবাহন যে বন্ধ। মহামিছিলে মহাগর্জনে আজ শহর কেঁপে ওঠে। মিছিলের সব গর্জন আজ তিলোত্তমাকে হজম করতেই হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ জনতার পদচিহ্নে সে ক্লান্ত হলেও অক্লান্ত মনে সহ্য করতেই হয়। শহর বলে কথা! গঙ্গার মতো সব মিটিং-মিছিলের সাক্ষী তাকে থাকতে হয়। সরকার আসে যায় কিন্তু মিটিং-মিছিল থেকে যায়। শহরের কী যে ব্যথা শহরবাসীরা কখনো বোঝে। পতিত পাবনী গঙ্গার মতো শহরের যত পাপ নোংরা, আর্বজনা তাকে সব বইতে হয়। তিলোত্তমা তুমি কার? কেঁদে বলে সে 'মিছিলের'। তিলোত্তমা তুমি কেঁদো না। এ ব্রিজ অফ টু সিটিজ-এর গল্প নেই বলে দুঃখ কীসের? মিছিলের পরে তোমাকে উপহার দেব গঙ্গার তীরে সবুজায়নের নার্সারি, নয়নাভিরাম সৌন্দর্যায়নের পার্ক। নদীর ঢেউ, পাখির গানে তোমার চোখে ঘুম আসুক স্বপ্ন দেখে।

—সুবল সরদার,
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

নারীবাদ নয়, নারীর ক্ষমতায়ন

সুতপা বসাক ভড়

ভারতীয় দর্শনে স্ত্রীজাতি সাক্ষাৎ শক্তিস্বরূপা। শক্তিও স্বয়ং সমর্থ ও সক্ষম হন। অপরদিকে স্ত্রী বিদ্যা, বুদ্ধি ও লক্ষ্মীর প্রতিমূর্তি। আমাদের সংস্কৃতিতে স্ত্রীজাতি একাধারে শক্তি, বুদ্ধি ও বৈভবকে রূপায়িত করে, যা সম্পূর্ণ বিশ্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার একজন সামাজিক কার্যকর্তা জি.ডি. এন্ডারসন ২০১৪ সালে বলেছেন, 'নারীবাদ মহিলাদের শক্তিশালী করার নাম নয়, মহিলারা আগে থেকেই শক্তিশালী; এটি হলো তাঁদের প্রতি পৃথিবীর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার একটি প্রচেষ্টা মাত্র।' প্রাচীন ভারতীয় পরম্পরাতে নারী প্রথম থেকেই এতটাই শক্তিশালী ছিলেন যে, একদিকে তাঁরা বিদ্যাধ্যয়ন ও শাস্ত্রার্থে পারদর্শী ছিলেন; অপরপক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সামনে পরাক্রমের প্রদর্শনও করতেন।

ইতিহাসের কালখণ্ডে বিশেষ কিছু কালো অধ্যায়ের জন্য বর্তমানে আমাদের দেশে নারীর ক্ষমতায়ন বা তাঁদের অধিকারের কথা বলতে হচ্ছে। ঋকবেদে মুদ্গলানী নামক নারী ঋষির উল্লেখ আছে, যিনি বেশ কিছু রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে কয়েক হাজার গোধন লাভ করেছিলেন। সেইরকম বিপস্সলা নামক নারী ঋষির যুদ্ধ করার সময় হাত ভেঙে যাওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পরম্পরার প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই বনবাসী বীরাঙ্গনা ফুলো, ঝানোর মধ্যে। আমরা যাঁদের উজ্জ্বল উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছি, তাঁরা হলেন রানি রুদ্রম্মা, রানি দুর্গাবতী, রানি অহল্যাবাই, রানি চেন্নাম্মা, রানি লক্ষ্মীবাই, রানি গাইদিলল্যু এবং আরও অনেকে।

পাশ্চাত্যের তুলনায় ভারতবর্ষে মহিলাদের স্থান অনেক উঁচুতে ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্যের দেশে মহিলাদের 'ডাইনি' অপবাদ দিয়ে পুড়িয়ে মারা হতো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম একজন পুরুষ জন স্টুয়ার্ট তাঁর পুস্তক 'অন লিবার্টি'র মাধ্যমে স্ত্রীমুক্তির কথা বলেছেন। অথচ ভারতীয় পরম্পরায় 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতা' বাক্যটি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত।

সাহিত্য চেতনার দৃষ্টি থেকেও ভারতীয় মহিলাদের মুক্তির বিচার পশ্চিমের আগেই উল্লেখিত হয়েছে। মনে করা হয় যে বিখ্যাত ফরাসি নারীবাদী দার্শনিক সিমোন দ্য পেউসার লেখা পুস্তক 'দ্য সেকেন্ড সেক্স' ১৯৪৯ সালে সবার সামনে আসে এবং এর মাধ্যমে পশ্চিমের দেশে নারীবাদের সূচনা হয়। অথচ এর আগে, ১৯৪২ সালে মহাদেবী বর্মার লেখা 'শৃঙ্খলা কী কড়িয়া'-তে ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে নারীবাদ প্রসঙ্গ দৃঢ়তার সঙ্গে অভিব্যক্ত করা হয়েছিল।

বর্তমান কেন্দ্র সরকারের প্রকল্পগুলি মহিলাদের শিক্ষাগত, সামাজিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে সাহায্য করছে। 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' প্রকল্পটি মাতৃশক্তির উন্নতিকল্পে খুবই সাহায্যকারী প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া কিশোরীদের জন্য 'সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা', মায়েদের জন্য 'জননী সুরক্ষা যোজনা' মহিলাদের সাহায্য করছে। বর্তমানে আইটি, মেডিক্যাল, সেনা, খেলাধুলা, রাজনীতি, প্রশাসন, কৃষি থেকে কর্পোরেট সর্বক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণযোগ আমরা দেখতে পাচ্ছি।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার পিছিয়ে পড়া, বনবাসী মেয়েদের সমগ্র বিকাশের জন্য দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা, জনজাতি মহিলা সশক্তিকরণ যোজনা, কৌশল বিকাশ এবং উপার্জন সম্পর্কিত যোজনা লাগু করেছে, যা মহিলাদের কল্যাণের পথ প্রশস্ত করেছে। এখন বাড়িতে শৌচাগার, গরিব মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগ, আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য যোজনা, প্রত্যেক বাড়িতে বিজলি এবং কলের জল দেওয়ার প্রচেষ্টার ফলে মহিলাদের জীবনযাত্রা সহজতর হয়েছে। মহিলাদের আর্থিক সহযোগিতা বেড়েছে।

নতুন রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে কন্যা ও মহিলাদের জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধা আছে। এমনকী পদ্মশ্রী ও পদ্মভূষণের মতো সাম্মানিক নাগরিক পুরস্কারগুলি পিছিয়ে পড়া, বনবাসী মহিলাদের দিয়ে, তাঁদের সম্মানিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গৌরবময় ভারতবর্ষে শক্তিশালী মাতৃশক্তির ভূমিকা আগামীদিনে আরও প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ও উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে এমন প্রত্যয় প্রত্যেক মহিলার মধ্যে জাগ্রত হয়ে উঠবে, এমনটাই আশা করা যায়। □

মহা গুণকারী মশলা মেথি

রিংকী ব্যানার্জি

মেথি বললেই অনেক সুস্বাদু খাবারের নাম আমাদের মনে আসে। মেথির পরোটা থেকে শুরু করে আলু মেথির সবজি— মেথি রান্নার স্বাদ বাড়ানোর কাজ করে। আমাদের

অতি প্রিয় পাঁচফোড়নের একটি উপাদান এই মেথি। মেথি দেখতে খয়েরি রঙের হয়। মেথিতে থিয়ামিন, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন-এ, বি-৬, ও সি থাকে। এছাড়াও রয়েছে কপার, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম। মেথি গাছের পাতায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-কে রয়েছে। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক মেথি খেলে কী উপকার হয়।

ডায়াবেটিস : মেথির বীজে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার ও অন্যান্য উপাদান থাকে যা হজমের ক্ষমতা ও শরীরের শর্করা বা সুগার শোষণ করার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। রিসার্চ অনুযায়ী, প্রতিদিন গরম জলে ভিজিয়ে রাখা ১০ গ্রাম মেথির বীজ ডায়াবেটিস টাইপ-২ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কার্যকর। মেথির গুঁড়ো দিয়ে তৈরি রুটি, টাইপ-২ ডায়াবেটিস আক্রান্ত লোকেদের ইনসুলিন প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

কোলেস্টেরল : মেথি শুধুমাত্র রক্তের কোলেস্টেরল থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে তা নয়, শরীরকেও ধীরে ধীরে কোলস্টেরল থেকে হওয়া ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। মেথি শরীরের লিপো প্রোটিন বা ব্যাড প্রোটিন কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া লিভার থেকে তৈরি তরলের পোষণের হার কমিয়ে দিতেও কার্যকর। চর্বিযুক্ত খাবার থেকে তৈরি হতে থাকা ট্রিগ্লাইসারাইডের মাত্রা কমিয়ে দেয়।

বাতের ব্যথা : বাতের ব্যথা প্রায় সব চল্লিশোর্ধ্ব মানুষের সমস্যা। ইন্ডিয়ান জার্নাল অব মেডিক্যাল রিসার্চের প্রতিবেদন অনুসারে, মেথির ইস্ট্রোজেনের ওপর প্রভাব এতটাই বেশি যে এ সময়ের ডাক্তাররা মেথির ব্যবহারকে ইস্ট্রোজেন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির সঙ্গে তুলনা করেছেন। মেথি বাতের তীব্র ব্যথা কমাতে সাহায্য করে।

হার্টের সমস্যায় : হার্টের স্বাস্থ্য রক্ষায় মেথির উপকারিতা অপরিসীম। মেথি শরীর থেকে অ্যাসিডের পরিমাণ খুব তাড়াতাড়ি কমাতে পারে। শরীরের অ্যাসিডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে এর থেকে কার্যকরী ভেষজ মেলা ভার। মেথির বীজ সারারাত জলে ভিজিয়ে রেখে দিয়ে পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে খেলে হার্টের ব্যথা বা বুক জ্বালার মতো সমস্যা দূর হয়।

ঋতুকালীন ব্যথা : পিরিয়ডসের ব্যথা সব মেয়েদের জীবনে বিভীষিকার মতো ও মাসের ওই বিশেষ সব দিনে মেজাজ খারাপ থাকা বা স্কুল-কলেজ কামাই করার মতো ঘটনা প্রায় সবার জীবনে ঘটে। চিন্তা নেই। মিলবে সমস্যার সমাধান। ইউটেরাসে মৃত টিস্যুর সংখ্যা বাড়তে থাকলেই পিরিয়ডসের ব্যথা শুরু হয়। মাসের ওই বিশেষ সব দিনে গরম মেথি দিয়ে তৈরি চা খেতে পারেন।

হজমের সমস্যায় : মেথির বীজে প্রচুর ফাইবার ও অন্যান্য উপাদান থাকে যা হজমের ক্ষমতা ও শরীরের সুগার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। মেথিদানা ভেজানো জল রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে খেলে হজমের সমস্যা ধীরে ধীরে কমে যায়।

ব্রেস্টের দুধ তৈরি করে : মেথিতে থাকা ডায়োসজেনিন দুধ তৈরিতে সাহায্য করে। মেথিতে থাকা ভিটামিন, মিনারেল মায়েদের দুধের পুষ্টিগুণ বাড়িয়ে তা নবজাতকের জন্য উন্নতমানের করে তোলে।

ওজন কমাতে : মেথি দানা হলো লোহা, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, কপার, ভিটামিন সি, প্রোটিন ও ফাইবারের উৎস। মেথি বীজে এক ধরনের ফাইবার থাকে যা গ্যালাক্টোমান্নান নামে পরিচিত। সহজে জলে গুলে যায়, যা আপনার খিদের অনুভূতিকে প্রশমন করে ওজন কমাতে সাহায্য করে। যার ফলে মেদ ঝরে যায়।

রক্তচাপ কমায় : মেথির বীজে পটাসিয়াম ও ফাইবার থাকার জন্য রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। দু' চামচ মেথি দানা জলের মধ্যে ২ মিনিট ফুটিয়ে নিন। এরপর ছেঁকে নিয়ে সব বীজ একটা আলাদা জায়গায় নিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। এটা দিনে ২ বার সকালে খালি পেটে খেয়ে নিন। আপনি ২ থেকে ৩ মাসের মধ্যে উন্নতি লক্ষ্য করবেন।

(লেখক একজন প্রাকৃতিক চিকিৎসক)

আদালতের পথে কার্নিমোজি। ফাইল চিত্র

গ্রেপ্তার ডি রাজা (ফাইল চিত্র)

কংগ্রেসের ডিএনএ-র দাম দিচ্ছে তৃণমূল

বিমলশঙ্কর নন্দ

পশ্চিমবঙ্গের টেলিভিশন দর্শককুল কোন অনুষ্ঠান বেশি দেখেন সে নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক, সমীক্ষার শেষ নেই। সন্ধ্যেবেলার সোপ অপেরা যাকে আমরা সিরিয়াল বলে জানি সেগুলো যে সব দেশে সব সমাজে জনপ্রিয় এটা সকলেই স্বীকার করেন। তবে বাঙ্গলার সমাজে যেহেতু রাজনীতিও মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, তাই নিউজ চ্যানেলগুলিরও এখানে বিপুল জনপ্রিয়তা। বিশেষত লোকসভা বা বিধানসভা নির্বাচনের সময় নিউজ চ্যানেলগুলির দর্শক সংখ্যা বেড়ে যায় ব্যাপক পরিমাণে। ২০২২ সালের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে কোনো গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন ছিল না। ১৮ জুলাই ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এবং ২১ জুলাই ভোট গণনার সময় মানুষের মধ্যে কিছু পরিমাণ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল বটে, তবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফল কী হতে পারে তা সকলেই জানতো। তাই 'কী হয় কী হয়' ভাব একেবারেই ছিল না। কিন্তু নির্বাচনের মতো কোনো গুরুত্বপূর্ণ 'ইভেন্ট' ছাড়াই জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে বাংলার নিউজ চ্যানেলগুলি গুনে গুনে দশগোল দিয়েছে এন্টারটেইনমেন্ট চ্যানেলগুলিকে। বাঙ্গলার প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জির (যিনি আবার তৃতীয় তৃমমূল সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, তথ্যপ্রযুক্তি, পরিষদীয় বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলোর মন্ত্রী এবং শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসচিব ছিলেন) অত্যন্ত 'ঘনিষ্ঠ' অর্পিতা মুখার্জির একাধিক ফ্ল্যাট থেকে কোটি কোটি টাকা, বিদেশি মুদ্রা, কেজি কেজি সোনা ও রূপো উদ্ধার, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির হদিশ বাঙ্গলার অধিকাংশ টেলিভিশন দর্শককে আবার নিউজ চ্যানেলগুলির সামনে বসিয়ে দিয়েছে। অনেকটাই পিছিয়ে গেছে এন্টারটেইনমেন্ট চ্যানেল। কারণ সত্যিকারের

এন্টারটেইনমেন্টের একেবারে 'ফুল প্যাকেজ' পাওয়া গেছে নিউজ চ্যানেলগুলির কাছ থেকেই।

পার্থ চ্যাটার্জির 'ঘনিষ্ঠ' অর্পিতা মুখার্জির বিলাসবহুল টালিগঞ্জের ফ্ল্যাট থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক অপরাধ সংক্রান্ত তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টোরেট (ইডি) কর্তৃক প্রায় ২২ কোটি টাকার অর্থ, বিদেশি মুদ্রা, সম্পত্তির নথিপত্র, স্কুল সার্ভিসের চাকরি সংক্রান্ত নথিপত্র উদ্ধার বাঙ্গালি সমাজকে ঝাঁকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার ঠিক দুদিন পরেই সেই অর্পিতা মুখার্জির বেলঘরিয়ার আরেক বিলাসবহুল ফ্ল্যাট থেকে ২৮ কোটির বেশি টাকা, ৫ কেজির বেশি সোনার বাট, অসংখ্য রূপোর মুদ্রা (রূপোর ওজন পাওয়া যায়নি) আরও বহুরকম কুবেরের বিষয়আশয় কিংবা যখের ধন উদ্ধার বাঙ্গলার রাজনীতিকে একেবারে নগ্ন করে দিয়েছে। টেলিভিশনের পর্দায় মিনিটে মিনিটে টাকা উদ্ধারের রানিং কমেন্ট্রি, টাকার পরিমাণের হিসেবে কে জিতবে— টালিগঞ্জের ফ্ল্যাট নাকি বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাট সে ব্যাপারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টান টান উত্তেজনা, সঙ্গে চায়ের সঙ্গে চানাচুর বা পাঁপড় ভাজার মতো প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর বান্ধবীর সংখ্যা, সিনেমা জগৎ ছাড়াও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ পদ কোন কোন বান্ধবী অলংকৃত করেছেন, কীভাবেই-বা তারা চাকরিগুলি বাগিয়েছিলেন তাঁর রসালো আলোচনা পরিবেশিত হচ্ছিল।

হারিয়ে যাচ্ছিল সনাতন শাশ্বত ভারতের কিছু ভাবনা যা বহুদিন ধরে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা বহন করে চলেছেন। যেমন শিক্ষা এক পবিত্র বিষয়, শিক্ষাঙ্গন মন্দিরের মতো, শিক্ষকরা গুরুস্থানীয়, কারণ সমাজকে সঠিক দিশা তাঁরাই দেখান। বাঙ্গলায় আক্রান্ত হয়েছে এই শিক্ষাজগৎ। শাসকরা ইচ্ছে করেই শিক্ষাজগৎটিকে বেছে নিয়েছে দূষিত করা এবং তাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য। এই প্রক্রিয়া সমানে চলেছে বিগত শতাব্দীর ৬০-এর দশকের শেষ থেকেই। উগ্র বামপন্থী নকশালদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল এ রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষক সমাজ। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সময়কালে শাসক কংগ্রেস দলের নেতাকর্মীদের দাপাদাপি চলছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে। ১৯৭৭ থেকে শুরু হওয়া ৩৪ বছরের বামশাসনে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল পার্টির জমিদারিভুক্ত একটি ক্ষেত্র সেখানে নেতাদের নির্দেশই ছিল আইন। ২০১১ সলে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর মানুষের মধ্যে এক ক্ষীণ আশা ছিল যে অন্তত শিক্ষাজগৎটা দলীয় রাজনীতির নিয়ন্ত্রণমুক্ত হবে। তার বদলে গত ১১ বছরে যা ঘটেছে তাকে ভয়াবহ বললেও বোধ হয় কম বলা হবে। সুপরিকল্পিত ভাবে শিক্ষার জগৎকে ধ্বংস করা হয়েছে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ দুর্নীতি, প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি এরাজ্যে শিক্ষার কফিনে শেষ পেরেক। শিক্ষাব্যবস্থা আর খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে নেই। গড়িয়ে খাদে পড়া কোনো যাত্রীবাহী বাসের মতো তার চারিদিকে কেবল ধ্বংসস্তূপ।

ঘুষ নিয়ে শিক্ষক নিয়োগের কথা সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে, কারণ শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে এই মাত্রার দুর্নীতি ভারতে আর কোথাও হয়নি। কিছুটা তুলনা করা যায় হরিয়ানায় ১৯৯৯-২০০০ সালে ৩২০৮ জন জুনিয়র বেসিক টিচার নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে। এই নিয়োগ দুর্নীতিতে ১৫০ কোটি টাকা ঘুষের প্রমাণ মেলে এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমপ্রকাশ চৌথালা, তাঁর পুত্র অজয় চৌথালা ও তিনজন সরকারি অফিসার এবং আরও প্রায় ৫০ জনের কারাদণ্ড হয়। ২০১৭ সালে ভারতের সুপ্রিমকোর্ট ত্রিপুরায় বেআইনি ভাবে নিযুক্ত ১০ হাজার ৩২৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল করে দেয়। ২০১৩ সালে তৎকালীন বাম সরকার কোনো নিয়ম না মেনেই এদের নিয়োগ করেছিল। ২০১৪ সালে ত্রিপুরা হাইকোর্ট এদের নিয়েগ অবৈধ ঘোষণা করেছিল। ২০১৭ সালে সুপ্রিমকোর্ট হাইকোর্টের রায়কেই বহাল রাখে। এই নিয়োগে আর্থিক লেন-দেনের কোনো অভিযোগ প্রকাশ্যে না এলেও কমিউনিস্টরা যে ব্যাপক দলবাজি করেছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় বাম সরকারের পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল এই শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারি।

ভারতের আরও বহু রাজ্যে নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ বহু সময়ে এসেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ২০২২-এর স্কুল শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি (দুর্নীতির এই পর্যায়টি শুরু হয়েছে ১০ বছর আগে থেকেই) চরিত্রগত ও মাত্রাগত দিক দিয়ে সবার ওপরে। এই দুর্নীতি অর্পিতা মুখার্জির টালিগঞ্জ ও বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাট থেকে ইডি কর্তৃক

উদ্ধার হওয়া ৫০ কোটি টাকা, ৫ কেজি সোনা, কয়েক কেজি রূপো, বহু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে কোনো ভাবেই সীমাবদ্ধ নয়। এই দুর্নীতির মাত্রা আরও অনেক বেশি। ২০১১-২০১২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ, ২০১৪ সাল থেকে স্কুল ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া তলিয়ে দেখলে যে পরিমাণ দুর্নীতি খুঁজে পাওয়া যাবে তা হয়তো ভারতের বৃহত্তম নিয়োগ দুর্নীতির শিরোপা অর্জন করতে পারে। অল্প কয়েকশো নিয়োগ পরীক্ষা করেই যদি তিনশোর কাছাকাছি মানুষের চাকরি যায় (যাদের মধ্যে মন্ত্রী পরেশ অধিকারীর কন্যাও আছেন) তাহলে অঙ্কের নিয়মে হাজার হাজার নিয়োগ পরীক্ষা করা সম্ভব হলে দুর্নীতির মাত্রা এবং আর্থিক লেন-দেনের পরিমাণ কত হতে পারে ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়।

এই সমস্ত ঘটনার প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলতেই হয়। মাত্র ১১ বছরের রাজত্বে একটি রাজনৈতিক দল রাজ্যকে আজ এই অবস্থায় নিয়ে এল কেন? কেন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে দলটিকে নিয়ে 'চোর', 'তোলাবাজ', 'চিটিংবাজ' প্রভৃতি শব্দগুলি বার বার ব্যবহৃত হয়? এই দলটির উদ্ভব ও

সাফল্যের মধ্যেই কি এই সম্ভাবনার বীজ প্রোথিত ছিল? এই প্রশ্নগুলির উত্তর পেতে গেলে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাহায্য নিতে হবে। ভারতে আঞ্চলিকতার আবেগকে সম্বল করে ক্ষমতায় এলেও দুর্নীতির পঙ্কে আকণ্ঠ ডুবে গেছে আঞ্চলিক দলগুলি। বিহারের রাষ্ট্রীয় জনতা দল উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টি এর প্রধান উদাহরণ। এর সঙ্গে বহুজন সমাজ পার্টিকে যুক্ত করা যেতে পারে। বহুজন সমাজ পার্টি নির্বাচনে কমিশনের বিধানে সর্বভারতীয় দলের মর্যাদা পেলেও প্রকৃতপক্ষে উত্তরপ্রদেশ ভিত্তিক একটি আঞ্চলিক দল। এই তালিকায় তৃণমূল কংগ্রেস এক উজ্জ্বল সংযোজন।

উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের আরও বহু দলের নাম উল্লেখ করা যায়। তবে ব্যতিক্রমও আছে। যেমন নবীন পট্টনায়কের নেতৃত্বাধীন ওড়িশার বিজু জনতা দল কিংবা বিহারের জনতা দল (ইউনাইটেড) যার নেতা মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। দুটি ক্ষেত্রেই দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। ২০০৫ সালে নীতীশ কুমার যখন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হন বিহার তখন ১৫ বছরের লালু-রাবড়ী জমানার জঙ্গলরাজের দুঃসহ অভিজ্ঞতায় দগ্ধ। দুর্নীতি ও অরাজকতার বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়ে ধীরে ধীরে তিনি পরিস্থিতির উন্নতি ঘটান। অর এক্ষেত্রে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছেন জোট শরিক ভারতীয় জনতা পার্টির কাছ থেকে। ২০০০ সালে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে আজ দীর্ঘ দুই দশকের বেশি ক্ষমতায় থেকেও নবীন পট্টনায়েক দুর্নীতি থেকে দূরে থাকতে পেরেছেন তাঁর দুর্নীতি বিরোধী নীতিগত অবস্থানের কারণে।

২০১১ সালে সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী লড়াইয়ের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার ছিল সততা। তৃণমূল নেত্রীকে তখন চিহ্নিত করা হতো সততার প্রতীক হিসেবে। অর্থাৎ বাম বিশেষত সিপিএম নেতা-কর্মীদের কার্যকলাপ, জীবনযাপন, পঞ্চায়েত ও পুরসভার বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি নিয়ে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। সেই প্রেক্ষাপটে তৃণমূল নেত্রীর সাধারণ জীবনযাপন, জনমুখী রাজনীতি মানুষকে আকর্ষণ করেছিল। ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূল কংগ্রেসের সামনে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল দুর্নীতিমুক্ত এবং জনমুখী প্রশাসন উপহার দেওয়া, যা সিপিএমের নিয়ন্ত্রণমূলক ও সংগঠনকেন্দ্রিক রাজনীতির বিকল্প হতে পারতো। কিন্তু সরকারে আসার পর তৃণমূলের প্রাথমিক লক্ষ্যই হয়ে দাঁড়িয়েছে যেভাবে হোক ক্ষমতায় থাকা। দুর্নীতি দমন এই দলের কাছে অগ্রাধিকার হয়ে উঠতে পারেনি। যেভাবে হোক ক্ষমতায় থাকতে গিয়ে এদের দুর্নীতির সঙ্গে আপোশ করতে হয়েছে। আপোশ করতে করতে ক্রমেই দুর্নীতির অতল তলে তলিয়ে গেছে। এর হাত থেকে দলটির পরিত্রাণের আর উপায় নেই।

দুর্নীতি বিরোধিতা একটি দলের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি অংশ। ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ ও ২০১৪ থেকে আজ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকলেও বিজেপির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নেই। কারণ দুর্নীতির বিরোধিতা বিজেপির রাজনৈতিক সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কিন্তু ভারতের অন্য জাতীয় দল কংগ্রেস সম্পর্কে এই কথা খাটে কি? পরিবারবাদের পাশাপাশি দুর্নীতির অভিযোগ বার বার উঠেছে এই দলের বিরুদ্ধে। এর সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হলো ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় কংগ্রেসের দুই শীর্ষ নেতা রাহুল গান্ধী ও সোনিয়া গান্ধীকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেটের তলব। এই মামলায় দুজনেই জামিনে আছেন। দুর্নীতির অভিযোগ পরিবারের অন্যদের বিরুদ্ধেও।

পরিবারবাদ, ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি ও দুর্নীতি হলো এক ভয়ংকর দুষ্টচক্র। কোনো দল এই আবর্তে ঢুকে পড়লে বেরিয়ে আসা কঠিন। এই ধরনের রাজনীতির ধারক ও বাহক হলো কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেস হলো ভারতের জাতীয় কংগ্রেসেরই একটি উপজাত গোষ্ঠী, সেই হিসেবে কংগ্রেসের সংস্কৃতিরই ধারক ও বাহক হলো এই তৃণমূল কংগ্রেস। কংগ্রেসের মতো তৃণমূল কংগ্রেসেরও কোনো মতাদর্শ নেই। এর লক্ষ্য একটাই। যেভাবেই হোক ক্ষমতার অলিন্দে থাকা তৃণমূলের লক্ষ্য। ক্ষমতার বাইরে থাকলে দলটির অস্তিত্বের সংকট দেখা দেবে। সঠিক মতাদর্শ মানুষ বা সংগঠনকে গঠনমূলক কাজে প্রেরণা জোগায়। মতাদর্শহীন রাজনীতি পর্যবসিত হয় ক্ষমতাসর্বস্ব রাজনীতিতে। তৃণমূল কংগ্রেস এখন এই রাজনীতিতে। তৃণমূল কংগ্রেস এখন এই রাজনীতির শিকার। এর হাত থেকে তৃণমূলের পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব।

(লেখক বিশিষ্ট অধ্যাপক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

ট্রেলারে পার্থ, ছবিতে অন্য কেউ

ভবানীশঙ্কর বাগচী

'চতুর্থ রাউন্ড শেষে ২৭ কোটি ৯০ লক্ষ। লিড করছে বেলঘরিয়া।' কী ভাবছেন? অন্তর্জালের কোনও মিমের কথা বলছি? না, ২৮ জুলাই সকালে নিজেদের মধ্যে আলোচনায় এই কথাগুলো বলছিলেন বাগুইআটি অটোস্ট্যান্ডে প্যাসেঞ্জারের পথ চেয়ে থাকা এক অটোচালক। পাশ দিয়ে তার সহকর্মী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, ইডি যেখানে হাত দিচ্ছে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা উঠে আসছে। বতেলাবাজ মন্ত্রীর বান্ধবীর ঘরে টাকার পাহাড়। আর আমরা ভাড়া বাড়ালেই সরকারের গায়ে জ্বালা ধরে। দেখলে মনে হয় সুবোধ বালক। অথচ পেটে পেটে এত।

সুবোধ বালকই বটে। গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। ফ্রেঞ্চকাট রুপোলি দাড়ি। চশমার আড়ালে থাকা খুঁতখুঁতে দুটো চোখ। পরনে পঞ্জাবি, পাজামা ও পায়ে স্নিকার্স। সেই জুতোর ফিতে নিজে বাঁধেন না। কাজের লোক বেঁধে দেন। মেদবহুল শরীরের কাঁধে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব। আবার পরিষদীয় মন্ত্রী। সে কারণে কপালে সর্বক্ষণ চিন্তার ভাঁজ। মুখে ক্লান্তির ছাপ। সত্তর ছুঁই ছুঁই পার্থ চট্টোপাধ্যায় যখন হাসেন অথবা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন, তখন মনে হতেই পারে, এমন নিরীহ গোছের নেতা-মন্ত্রী রাজনীতিতে দুর্লভ। কারণ তিনি ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না! তবে গিলে খান। তার নমুনা হালফিলে দেখা যাচ্ছে ইডির হানায়।

১৯৭০ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন পার্থ। অর্থনীতিতে স্নাতক হন ১৯৭৩ সালে। ১৯৮১-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ করেন। আবার ১৯৮২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই আইনের ডিগ্রি নেন। ২০১৬ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেন। যদিও অনেকেই বলেন, এই পিএইচডি ভুয়ো। পার্থ চট্টোপাধ্যায় নাকি হুবহু টুকে ডক্টরেট ডিগ্রি পকেটস্থ করেছেন। তারপর একটি কর্পোরেট সংস্থায় এইচ আর হিসেবে কর্মজীবন শুরু। একটা সময় কর্মজীবন ছেড়ে পুরোপুরি মনোনিবেশ করেন রাজনীতিতে। দক্ষিণপন্থী পার্থ আগাগোড়াই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী। তাঁর স্নেহভাজন। ২০১১ সালে এ রাজ্যের হাওয়া বদল হলে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারের মন্ত্রীসভার ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। প্রথমে শিল্পমন্ত্রী, পরে শিক্ষামন্ত্রী। উলট পুরাণ হয়ে আবার শিল্পমন্ত্রী। গ্রেপ্তার হওয়ার সময় তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসচিব।

শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্বে থাকার সময় থেকেই এসএসসি'র নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন বিরোধীরা। সেসব অভিযোগ বা সমালোচনা গায়ে মাখেননি তৃণমূলের মহাসচিব। গত বছর আইকোর চিটফান্ড কেলেঙ্কারি মামলায় পার্থকে জেরা করতে একেবারে শিল্প দপ্তরে হাজির হয়েছিল সিবিআইয়ের একটি দল। জেরা শেষে পার্থ স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মিডিয়ার সামনে বলেছিলেন, 'ওরা যা জানতে চেয়েছে, বলেছি। আবার ডাকলে সহযোগিতা করব।' সেদিন সিবিআই জেরার মুখে অকুতোভয় পার্থ মন জয় করে নিয়েছিলেন জয়বাংলার স্লোগানকারীদের।

খড়ের মধ্যে সূঁচের মতো পড়ে থেকে আরও অনেক অভিযুক্তকে তিনি সিবিআই জেরার মুখে মন শক্ত রাখার পাঠ পড়াচ্ছিলেন। পেশার এইচ আর বলেই বোধহয় আত্মবিশ্বাসে টইটম্বুর তিনি। কয়েকদিন আগে এসএসসি নিয়োগ নিয়ে তলব করে সিবিআই। তাতেও তাঁর বিশেষ হেলদোল দেখা যায়নি। বরং ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে বিরস বদনে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন তিনি। অবশ্য তার পরের দিনই ঘটলো বিপর্যয়। নাকতলার

বাড়িতে দীর্ঘ জেরার পর রাত ২টোর সময় রাজ্যের শিল্পমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে ইডি। তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের টালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে মিলেছে টাকার পাহাড়। শোবার ঘরে ২০০০ টাকা ও ৫০০ টাকার নোটের ছড়াছড়ি। সঙ্গে সোনার গয়না, লক্ষ লক্ষ ডলার এবং আরও। এই নগদ টাকা গুনতে ব্যাংক কর্মচারীরা দিনরাত এক করে দিয়েছেন। ১৩টি টাকার গোনার নেশিন অবিরাম নোটের গুনতি করেছে।

সবশেষে ১৩টি ট্রাঙ্ক ভর্তি টাকা ট্রাকে করে পাড়ি দিয়েছে ব্যাংকে। দুদিন পর বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাটে রেড করে পাওয়া গেছে প্রায় ২৯ কোটি নগদ। ৩ কেজি সোনার বার, ডায়মন্ড জুয়েলারি ও ২ কেজি ওজনের সোনার গয়না। এই বিপুল পরিমাণ টাকা, সম্পদের ছবি-সহ তথ্য ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপে ছড়াছড়ি। যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে থেকেই কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, যে তারা রাজ্যের টাকা কেটে নিচ্ছে। পেট্রোল-ডিজেল-গ্যাসের দাম বাড়া নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন, জিএসটি নিয়ে ভরা মঞ্চে মানুষকে উসকানি দেন, সেই রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী ও তাঁর বান্ধবীর কাছে কোটি কোটি নগদ টাকা এবং সম্পত্তি দেখে স্বাভাবিক ভাবে হতবাক হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গবাসী। বিশেষ করে যাঁরা তিন-তিনবার তৃণমূল কংগ্রেসকে একক মেজরিটির ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছেন, তাঁরাই আজ সবচেয়ে বেশি হতাশ। কারণ তাদের ঘরের যোগ্য ছেলে অথবা মেয়েটিকে বঞ্চিত করেই পার্থবাবুরা লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে চাকরি বিক্রি করেছেন। সেই অসৎ টাকাতেই গজিয়ে উঠেছে বারুইপুরের 'বিশ্রাম', বোলপুরের 'অপা', শান্তিনিকেতনের তিতলি এবং কসবার 'ইচ্ছে'। ফাঁস হওয়া তথ্য বলছে, এইসব অট্টালিকাতেই পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পা পড়তো রাতের অন্ধকারে। সঙ্গে থাকতেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। মাননীয়ার সিলমোহর দেওয়া পার্থর 'ওড়িয়া ভাষা জানা ভালো বন্ধু।'

অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে আদালতে পেশ করার দিন ইডির আইনজীবী বলেছিলেন, 'এই তদন্ত পেঁয়াজের মতো। খোসা যত ছাড়ানো হবে, ততই ভিতর থেকে আরও নানা তথ্য বেরিয়ে আসবে।' বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, ঘটনা

প্রায় সেদিকেই মোড় নিচ্ছে। ২০১৭ সালে মাত্র ৫৭ বছর বয়সে মারা যান পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী বাবলি চট্টোপাধ্যায়। তারও অনেক আগে থেকে অর্পিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পার্থবাবুর। দশ বছরেরও বেশি তাদের সম্পর্ক। মডেল-অভিনেত্রী অর্পিতার সঙ্গে কথা বলার জন্য নাকি ভুয়ো সিমকার্ড ব্যবহার করতেন শিল্পমন্ত্রী। রাত গভীর হলেই লং ড্রাইভে বেরিয়ে পড়তেন তাঁরা। এমনকী ফুরসত পেলেই অর্পিতার মামার বাড়িতে যেতেন 'অপা' জুটি। সূত্রের খবর, তিলজলার ভুয়ো ঠিকানা দিয়ে মহম্মদ সাব্বিরের নামে একটি সিমকার্ড তোলা হয়, যা ব্যবহার করতেন মন্ত্রী। সেই নম্বর থেকেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা হতো পার্থ-অর্পিতার। সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা পড়েছে আদালতে। শুধু ফোনে কথা নয়, তাঁরা নাকি মাঝেমধ্যেই বারুইপুরের বেগমপুরের 'বিশ্রাম'-এ বিশ্রাম নিতে যেতেন। সেখানকার পুকুরে মাছও ধরতেন।

জাঙ্গিপাড়ায় অর্পিতার মামার বাড়ি। সেখানে প্রায়ই যাতায়াত করতেন পার্থ। এমনকী সেখানকার পুকুর পাড়ে একসঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতেন 'অপা' জুটি। জাঙ্গিপাড়ার স্থানীয়রা বলছেন, দুর্গাপুজোর সময় জাঙ্গিপাড়াতেই কাটাতেন পার্থ। খেতেন অর্পিতার হাতে রান্না করা ভোগের খিচুড়ি। বর্তমানে ছ'খানা কোম্পানির মালিক অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। সেই সংক্রান্ত নথি ও ফাইলপত্র ইডি উদ্ধার করেছে পার্থর নাকতলার বাড়ি থেকে। এছাড়াও অসংখ্য জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাটের দলিলও বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। সবকটাই অর্পিতার নামে।

মডেল-অভিনেত্রী অর্পিতার সংক্ষিপ্ত অপরাধের তালিকাটি দেখলেই মানুষ ঠাহর করতে পারেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কতটা গভীর। তাছাড়া, ইডির মাধ্যমে সন্ধান পাওয়া সম্পত্তি ও ঘুষের টাকা বগলদাবা করার কালপ্রিট কে, তাও জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। জেরার মুখে অর্পিতা জানিয়েছেন, 'উনি (পড়ুন পার্থ চ্যাটার্জি) আমার বাড়িটাকে একটা মিনি ব্যাংক বানিয়ে ফেলেছিলেন।' এমন আরও বহু বিস্ফোরক সত্য উদ্ঘাটন করেছে ইডি যা সময় হলে মানুষ জানতে পারবেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা

খোঁজ পাওয়া অনেকগুলো বেআইনি বাড়ির একটি বোলপুরে।

গেছে, দালালদের হাত ঘুরে স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগে ঘুষের টাকা এসে জমা হতো অর্পিতাদের কাছে। সেখান থেকে টাকা পৌঁছাতো উপর তলায়। পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে ওই উপরতলার প্রভাবশালী পর্যন্তও নিশ্চয়ই পৌঁছে যাবেন তদন্তকারীরা। তা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

অর্পিতার পাশাপাশি আরও বহু ললনার নাম উঠে আসছে তদন্তে। নামগুলো ঘোরাফেরা করছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। অহনা, মোনালিসা, মানসী, সোমা ও সাবিনা। পার্থর লেডিলাকের লিস্টি কিন্তু বেশ লম্বা। একজন তো পার্থ ধরা পড়ার পর থেকেই ফেরার। অনাম্নী সেই অধ্যাপিকা অবার বাংলাদেশে পার্থর হাওলা মারফত টাকা পাচারের অংশীদার ছিলেন। নিয়োগ দুর্নীতি এবং টাকা তছরুপে পার্থর কৌশলটা বেশ ধরালো ছিল। বান্ধবীদের কাছে নগদ টাকা, সম্পত্তি মানে নিজের দিক থেকে নজর ঘুরিয়ে দেওয়া। তবে ইডি এবং সিবিআই যে আঁটসাঁট জাল পাতবে তা কে জানতো? সেই জাল কেটে বেরোতে পারলেন না বিশাল বপু মন্ত্রী এবং তাঁর ভালো বান্ধবী। তৃণমূলের পার্থ পর্বে একটা বড়ো ধাক্কা অবশ্যই এসএসকেএম হাসপাতাল। অদূর অতীতেও দেখা গেছে, এই দলের তাবড় নেতারা জেরার পর গ্রেপ্তারি এড়াতে অথবা গ্রেপ্তারের পর হাজতবাস এড়াতে শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়ে এসএসকেএমে গিয়ে ভর্তি হয়েছেন। বহল তবিয়তে জামাই আদরে তাদের হেফাজত শেষ হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এবারেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ধূপধুনো দিয়ে মন্ত্রীমশাইকে বরণ করার তোড়জোড় করেছিল। কিন্তু তাতে জল ঢেলে পার্থবাবুর মেডিক্যাল চেকআপ হয়েছে ভুবনেশ্বরে। তার পরই ইডির হেফাজত। এই প্রতিবেদন লেখার সময় ৩ আগস্ট পর্যন্ত পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঠাঁই সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির লকআপে।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, রাত দুটো নাগাদ ইডির গ্রেপ্তারির আগে 'পরমাত্মীয়' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করেছিলেন তিনি। সাড়া পাননি। ইডির অফিসারদের পার্থ বলেছিলেন, 'আমি যত রাতেই ফোন করি না কেন উনি ধরবেন।' কিন্তু ওপার থেকে

রাজমুখি অর্পিতা।

কোনও সংকেত ভেসে আসেনি পার্থবাবুর মোবাইলে। পরে অবশ্য একটু-আধটু প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার তত্ত্ব ঝেড়েছেন। তারপর দলগত দায় এড়িয়ে পার্থকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। মন্ত্রিত্ব থেকেও তিনি অপসারিত। তবে দল বা মন্ত্রিত্ব হারালেই সব পাপ ধুয়ে যাবে? কলকাতার রাজপথে যে কর্মপ্রার্থীরা পাঁচশো দিনেরও বেশি নাওয়া-খাওয়া ভুলে ধরনা দিচ্ছেন, তাদের কী হবে? তাদের যোগ্যতাকে বঞ্চিত করে লক্ষ লক্ষ টাকায় শিক্ষকতার চাকরি বিক্রি করে বহাল তবিয়তে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন যে পার্থ, কার প্রশ্রয় ছিল তাঁর মাথায়? পেঁয়াজের খোসা ধীরে ধীরে ছাড়াচ্ছে ইডি।

এরপর আসবে সিবিআই। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, ইডির কছে পার্থর সম্পত্তির ১২টি ঠিকানার তালিকা আছে। সবে দুটো জায়গায় রেড পড়েছে। তাছাড়া পার্থ-অর্পিতা ছাড়াও ১৪ জন প্রভাবশালীর নাম জমা রয়েছে ইডির ফাইলে। এক পার্থতেই পশ্চিমবঙ্গ উত্তাল। আর ১৩টা ধরা পড়লে সরকার বা দল কোনওটারই চিহ্ন থাকবে না বোধহয়। □

বঙ্গ বিদ্যার্থী ও স্টুডেন্টস ফর হোলিসটিক ডেভেলপমেন্ট অব হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আলোচনা সভা

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে বঙ্গ বিদ্যার্থী ও স্টুডেন্টস ফর হোলিসটিক ডেভেলপমেন্ট অব হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গত ২১ জুলাই মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিসে 'স্বাধীনতা ও দেশভাগের ৭৫ বছর' শীর্ষক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন উপাচার্য ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ও গবেষক ড. মোহিত রায়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিসের ডিরেক্টর ড. স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ বলরাম দাস রায়, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক মনোরঞ্জন জোয়াদ্দার এবং ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক শ্রীনিবাস।

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস তাঁর বক্তব্যে মনে করিয়ে দেন, কীভাবে স্বাধীনতার আগে থেকেই কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা একটা ন্যারেটিভ তৈরি করে ভারতের প্রকৃত ইতিহাস মুছে দিয়ে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে খুশি করার জন্য তাদের অত্যাচারগুলিকেও স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত করে। এই প্রসঙ্গে তিনি তিতুমিরের কথা উল্লেখ করে বলেন, তিতুমির একজন জেহাদি ছিলেন, হিন্দুদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করেন, অথচ কমিউনিস্টরা তার নোংরামি ঢাকার চেষ্টা করে গেছেন। কংগ্রেস-কমিউনিস্টদের এরকম অনেক উদাহরণ তিনি মনে করিয়ে দেন।

ড. মোহিত রায় বলেন, এই সময় পশ্চিমবঙ্গ বারুদের স্তূপের ওপর রয়েছে। তিনি বিগত কয়েক বছরের জেহাদিদের দ্বারা সরকারি সম্পত্তি ও হিন্দুদের ওপর সংগঠিত আক্রমণের উল্লেখ করেন।

ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ বলেন, আজ হিন্দু বাঙ্গালিরা নিজেরাই নিজেদের শত্রু হয়ে গেছে। শ্রীবলরাম দাস রায় বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামীর বলিদানের কথা উল্লেখ করেন। স্বাধীনতার পর এক বিশেষ সম্প্রদায়ের থেকে পর পর শিক্ষামন্ত্রী হওয়ায় বহু বলিদানের ইতিহাস মুছে দেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক মনোরঞ্জন জোয়াদ্দার বলেন, স্বাধীনতার সময় যে ধরনের মানসিকতা দেশভাগের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল, তা এখনো ভীষণভাবে সক্রিয় রয়েছে। এই মানসিকতা সমূলে উৎখাত করা প্রয়োজন। শ্রীনিবাস বলেন, দেশভাগের যন্ত্রণাদায়ক বেদনার কথা বর্তমান প্রজন্মের মনে জাগ্রত রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে মাসিক বঙ্গ বিদ্যার্থী পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আশিস আচার্য এবং ধন্যবাদ জানান সুমন চন্দ্র দাস।

রাজ্য জুড়ে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের কার্যকর্তা অভ্যাস বর্গ

গত ৩ থেকে ২৪ জুলাই প্রতি রবিবার সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত তিন সত্রে জেলায় জেলায় কার্যকর্তা অভ্যাস বর্গের আয়োজন করে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘ। রাজ্যের ২০টি জেলায় অনুষ্ঠিত বর্গে ৪০২ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। বর্গে পাঁচ ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন কার্যকর্তারা। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে রাজ্যের দু'হাজার বিদ্যালয়ে ভারতমাতার পূজা এবং সেই সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনী কীভাবে রাখা যায় সে সম্পর্কেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও বৈচারিক অধিষ্ঠান, কার্যকর্তা সংকল্পনা, কার্যক্রম, কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে সকলকে অবহিত করানো হয়। আগামীদিনে সংগঠানের বিস্তার ও দৃঢ়ীকরণের উদ্দেশ্যে এই বর্গ ফলদায়ী হয়। বর্গে সংগঠনের রাজ্য কার্যকর্তারা ছাড়া রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ ক্ষেত্র প্রচারক জলধর মাহাত ও উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ প্রদীপ অধিকারী-সহ বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। পুরুলিয়া জেলায় ছিলেন পূর্বতন এবিভিপি কার্যকর্তা, বর্তমানে পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাত।

ভারতে প্রীতিবন্ধনের উৎসব রাখিবন্ধন

সরোজ চক্রবর্তী

রাখিবন্ধন ভারতবর্ষে প্রীতিবন্ধনের উৎসব। হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ও শিখরা এই উৎসব পালন করেন। রাখিবন্ধন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে। আধুনিক ভারতীয় সমাজে রাখিবন্ধন সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। সামাজিক উৎসব হিসেবে রাখিবন্ধনের গুরুত্ব অপরিসীম। অতীতের বিভিন্ন পরিস্থিতি ও সময়ের প্রেক্ষাপটে রাখিবন্ধন প্রীতিবন্ধনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই রাখিবন্ধন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে পারিবারিক ও সামাজিক দিকটির পাশাপাশি ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বিষয়গুলি তুলে ধরে বিশ্লেষণ করলে এই উৎসবের পবিত্রতা ও ঈশ্বরীয় ভাবের একটা পরিষ্কার ছবি ফুটে ওঠে। রাখির এ বন্ধন যে কত শক্তিশালী এ বন্ধনের ক্ষমতা যে কত গভীর, এই বন্ধনের মাধ্যমে যে সম্পর্ক তৈরি হয় তা যে কত পবিত্র— তা অনুভব ও উপলব্ধি করা যায়।

পারিবারিক দিক

ভারতীয় পরিবারে রাখিবন্ধন এখন পারিবারিক উৎসব ও অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। রাখিবন্ধন উৎসবের দিন দিদি বা বোনেরা তাদের ভাই বা দাদার হাতে রাখি নামে একটি পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়। পবিবর্তে ভাই বোনকে যে উপহার দেয় তা সারাজীবন তাকে রক্ষা করার শপথ নেয়। এরপর ভাই-বোন পরস্পরকে মিষ্টি খাওয়ায়। উত্তর ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে সহোদর ভাই-বোন ছাড়াও জ্ঞাতি ভাই-বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যেও রাখিবন্ধন উৎসব প্রচলিত। অনাত্মীয় কাউকেও ভাই বা দাদা মনে করে রাখি পরানোর রেওয়াজ রয়েছে। এর মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও গাঢ় হয়। পরিবারে ও সমাজে বোন বা দিদি অর্থাৎ নারীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দেওয়ার একটা অলিখিত দায়িত্ব ও কর্তব্য চলে আসে ভাই বা দাদাদের উপর।

সামাজিক

আধুনিক ভারতে রাখিবন্ধন উৎসবের একটা সামাজিক দিক রয়েছে। ভারতবাসীর মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের প্রেম ভাবনাটি সুপরিকল্পিত ভাবে তুলে ধরেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ করার জন্য তিনি রাখিবন্ধন উৎসব পালন করেছিলেন। তিনি কলকাতা, ঢাকা ও সিলেট থেকে হাজার হাজার মানুষকে আহ্বান করেছিলেন ‘একতার প্রতীক’ হিসেবে রাখিবন্ধন উৎসব পালন করার জন্য।

সেই সময় দেশে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা চরম পর্যায়ে ছিল। ইংরেজ শাসিত তথা পরাধীন ভারতে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা আনার জন্য হিন্দু-মুসলমান ভাই-বোনেরা একে অপরের হাতে রাখি বেঁধেছিলেন। দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করার জন্য রাখিবন্ধন উৎসব পালন করা হয়েছিল।

উনিশ শতকে ভারত তথা বাঙ্গলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চরম আকার নেয়। এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে চায়। ১৯০৫ সালের জুন মাসে কার্জন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৯০৫ সালের আগস্ট মাসে বঙ্গভঙ্গ আইন পাশ করা হয়। এই আইন কার্যকরী হয় ১৬ অক্টোবর, ১৯০৫। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলা এবং বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সকলকে রাখিবন্ধন উৎসব পালন করার জন্য আহ্বান করেন। এই দিনটির উদ্দেশে কবিগুরু 'বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল পুণ্য হউক, পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান'— এই গানটি লিখেছিলেন।

ঐতিহাসিক দিক

একটি কিংবদন্তী অনুযায়ী, ৩২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করলে আলেকজান্ডারের স্ত্রী রোজানা রাজা পুরুকে একটি পবিত্র সুতো পাঠিয়ে তাঁকে অনুরোধ করেন আলেকজান্ডারের ক্ষতি না করার জন্য। ভারতীয় হিন্দুরা যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককে পবিত্র মনে করে সম্মান করতেন এই তথ্য আলেকজান্ডারের স্ত্রী কোনও ভাবে জানতে পেরে রাজা পুরুর কাছে তাঁর স্বামীর রক্ষায় এই পবিত্র সুতো পাঠিয়েছিলেন বলে জানা যায়। এই কারণেই যুদ্ধক্ষেত্রে রাজা পুরু আলেকজান্ডারকে আঘাত করেননি। পবিত্র রাখিবন্ধনকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজা পুরু সেদিন শরীরে আঘাত সহ্য করে আলেকজান্ডারের কাছে বন্দি স্বীকার করেছিলেন।

জানা যায়, গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ চিতোর আক্রমণ করলে বিধবা রানি কর্ণাবতী অসহায়বোধ করেন। সেই সময় (অর্থাৎ ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে) মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে একটি রাখি পাঠিয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। কর্ণাবতীর রাখি পেয়ে অভিভূত হয়ে হুমায়ুন চিতোর রক্ষা করার জন্য সৈন্য পাঠান। কিন্তু সেনা পাঠাতে হুমায়ুনের দেরি হয়ে যাওয়ায় বাহাদুর শাহ রানির দুর্গ জয় করে নিয়েছিলেন। শোনা যায়, বাহাদুর শাহের সেনাবাহিনীর হাত থেকে সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য ১৫৩৫ সালের ৮ মার্চ রানি কর্ণাবতী ১৩,০০০ পুরস্ত্রীকে নিয়ে জহরব্রত পালন করে আত্মাহুতি দেন। চিতোরে পৌঁছে হুমায়ুন বাহাদুর শাহকে দুর্গ থেকে উৎখাত করে রানি কর্ণাবতীর ছেলে বিক্রমজিৎ সিংহকে সিংহাসনে বসান। মধ্য সপ্তদশ শতকের 'রাজস্থানি লোকগাথা' থেকে এরকম বহু ঘটনা জানা যায়, যা রাখিবন্ধনের গুরুত্ব ও পবিত্রতাকে প্রকাশ করে।

পৌরাণিক দিক

মহাভারতে কৃষ্ণ-দ্রৌপদীর একটি ঘটনা রাখিবন্ধনের উদাহরণ হিসেবে বলা যায়। শিশুপাল বধের সময় কৃষ্ণের আঙুলে সুদর্শন চক্রের ঘর্ষণে রক্তপাত শুরু হলে দ্রৌপদী তাঁর শাড়ির আঁচল খানিকটা ছিঁড়ে কৃষ্ণের আঙ্গুলে বেঁধে দেন। এতে কৃষ্ণ অভিভূত হয়ে যান। দ্রৌপদী তাঁর অনাত্মীয় হলেও তিনি দ্রৌপদীকে নিজের বোন বলে ঘোষণা করেন এবং দ্রৌপদীকে এর প্রতিদান দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। বহু বছর পর পাশা খেলায় কৌরবরা দ্রৌপদীকে অপমান করে তাঁর বস্ত্রহরণ করতে গেলে শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর সম্মান রক্ষা করে সেই প্রতিদান দেন। এভাবে রাখিবন্ধনের গুরুত্ব বাড়তে থাকে।

পুরাণের একটি গল্পে বলিরাজা ও লক্ষ্মীর রাখিবন্ধনের ঘটনা রয়েছে। দৈত্যরাজ বলি ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। এক সময় বিষ্ণু বৈকুণ্ঠ ছেড়ে বলিরাজার রাজ্য রক্ষা করতে এসেছিলেন। সেই সময় লক্ষ্মীদেবী স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য ছদ্মবেশে বলিরাজের কাছে আসেন। লক্ষ্মীদেবী বলিকে বলেন, তাঁর স্বামী নিরুদ্দেশ। যতদিন না স্বামী ফিরে আসেন ততদিন যেন বলি তাঁকে আশ্রয় দেন। বলিরাজা ছদ্মবেশী লক্ষ্মীদেবীকে আশ্রয় দিতে রাজি হন। শ্রাবণী পূর্ণিমা উৎসবে লক্ষ্মী বলিরাজার হাতে একটি রাখি বেঁধে দেন। বলিরাজা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে
লক্ষ্মীজেবী রাখিবন্ধনের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং ভ্রাতৃত্বের মধুর সম্পর্কের ব্যাখ্যা করে নিজের আত্মপরিচয় দেন। বলিরাজা লক্ষ্মীকে বোনের সম্মান দেন এবং তাঁর রক্ষার্থে ও রাখিবন্ধনের পবিত্র সম্পর্ককে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিষ্ণুকে বৈকুণ্ঠে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। বলিরাজা বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেন। পৌরাণিক দিক থেকেও শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিটি রাখিবন্ধন হিসেবে বোন বা দিদিদের কাছে তাই খুবই সম্মানের।

শোনা যায়, শ্রীগণেশের বোন গণেশের হাতে একটি রাখি বেঁধে দেন। এই রাখিবন্ধনের গুরুত্ব শুনে গণেশের দুই পুত্র 'শুভ' ও 'লাভে'র মনে কষ্ট হয়। কারণ তাঁদের কোনও বোন ছিল না। এজন্য গণেশ দুই ছেলের সন্তোষ বিধানের জন্য দিব্য আগুন থেকে একটি কন্যার জন্ম দেন। এই দেবী হলেন গণেশের মেয়ে 'সন্তোষী মা'। সন্তোষী মা শুভ ও লাভের হাতে রাখি বেঁধে দেন। এই ঘটনাটি বলিউডের জনপ্রিয় চলচ্চিত্র 'জয় সন্তোষী মা' (১৯৭৫)-এর মধ্যেও রয়েছে।

রাখি কেবলমাত্র একটি সুতো নয়। রাখি পরানোর মাধ্যমে দিদি বা বোনেরা ভাইয়ের প্রতি ভলোবাসা প্রকাশ করে এবং ঈশ্বরের কাছে তাঁদের মঙ্গল কামনা করে। অপরদিকে ভাইয়েরা দিদি বা বোনের কাছে রাখি পরার সময় তাদের আজীবন রক্ষা করার শপথ নেয়। ভারতবর্ষে এই উৎসব শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমার দিন পালন করা হয় বলে রাখিবন্ধন উৎসবকে রাখিপূর্ণিমাও বলা হয়। রাখিবন্ধন উৎসবের মধ্যে রয়েছে এক গৌরব। এক শ্রদ্ধা। রাখিবন্ধনের মধ্যে রয়েছে এর অপরিমেয় ও অপরাজেয় শক্তি। রাখিবন্ধন হলো তাই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের এক সুমহান আদর্শ। ভালোবাসা, সুরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রতীক। □

রামকানাই অধিকারী প্রতিষ্ঠিত ঝুলনযাত্রা

সপ্তর্ষি ঘোষ

মধ্য কলকাতার বৌবাজার এলাকায় ১ নম্বর বাবুরাম শীল লেনে রামকানাই অধিকারীর ঠাকুরবাড়ির ঝুলন কলকাতার একটি অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ ঝুলনযাত্রা। রামকানাই অধিকারীর প্রপিতামহ কৃষ্ণমোহন অধিকারী আজ থেকে দুই শতাধিক বছর আগে বৌবাজারে ঠাকুরবাড়ি তৈরি করে রাধাকৃষ্ণ, গৌর নিতাই ও জগন্নাথদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঝুলনযাত্রার সূত্রপাত করেন, নিরবচ্ছিন্নভাবে যা আজও অব্যাহত। কষ্টিপাথরে নির্মিত কৃষ্ণ এবং অষ্টধাতুর রাধিকা মূর্তি কাষ্ঠনির্মিত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। অত্যন্ত নয়নাভিরাম এই যুগল মূর্তি। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে এই ঠাকুরবাড়ি 'রামকানাই অধিকারীর ঠাকুরবাড়ি' নামে সমধিক পরিচিত। ঠাকুরবাড়িতে তিনটি আলাদা সিংহাসনে রাধাবল্লভ জীউ ও রাধারানি, গৌর নিতাই, জগন্নাথদেব ও মা লক্ষ্মী অধিষ্ঠিত। রাধাবল্লভ কষ্টিপাথরে নির্মিত এবং রাধারানি অষ্টধাতুর। অত্যন্ত নয়নাভিরাম তিন যুগল মূর্তি।

কৃষ্ণমোহনের প্রপৌত্র রামকানাই অধিকারী (১৮৫৩-১৯২৫) ঠাকুরবাড়ির উন্নতিসাধন করেন এবং তাঁর সময় থেকেই ঝুলনযাত্রায় জাঁকজমক বৃদ্ধি পায়। তিনি ঝুলনে সংগীতানুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন। রামকানাই নিষ্ঠাবান ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। সমাজসেবী হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাঁর দান করা জমিতে গড়ে উঠেছে মধ্য কলকাতার শতাব্দী প্রাচীন পাঠাগার 'শান্তি ইন্‌স্টিটিউট'। রাধাবল্লভ এবং রাধারানির জন্য তিনি স্বর্ণালংকার তৈরি করান এবং ঝুলন উৎসবের জন্য রূপোর সিংহাসন নির্মাণ করান। ঠাকুরবাড়ির নিত্যসেবা এবং অন্যান্য উৎসবের ব্যয় নির্বাহের জন্য রামকানাই একটি ট্রাস্ট গঠন করেন। ইংরেজি ১৯২৫ সালে ৭২ বছর বয়সে রামকানাই অধিকারীর জীবনাবসান হয়।

তাঁর মৃত্যুর পর একমাত্র পুত্র ধর্মদাস অধিকারী ঠাকুরবাড়ির সেবায়েতের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ৬৩ বছর বয়সে ইংরেজি ১৯৪১ সালে তিনি প্রয়াত হন। পরবর্তীকালে ধর্মদাস অধিকারীর দুই পুত্র শিবদাস অধিকারী (১৯২৩-১৯৯৮) ও দেবদাস অধিকারী (১৯২৬-২০১০)-র উপর সেবায়েতের দায়িত্ব অর্পিত হয়। আমৃত্যু তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে সপ্তম প্রজন্ম পূর্বসূরির ঐতিহ্যকে সগৌরবে বহন করে চলেছেন।

ঝুলনের পাঁচদিন রাধাবল্লভ ও রাধারানিকে যথাক্রমে রাখাল, যোগী, সুবল, কোটাল এবং রাজবেশ— পাঁচরকম বেশে সাজানো হয়। একদা প্রয়াত শিবদাস অধিকারী নিজে রাধাবল্লভ ও রাধারানিকে সাজাতেন। বর্তমানে তাঁর পুত্র শুভাশিস (রাজা) এই দায়িত্ব পালন করছেন।

ঝুলনের পাঁচ দিন রাধাবল্লভ ও রাধারানি রুপোর সিংহাসনে অধিষ্ঠান করেন। অতিহ্যপূর্ণ ঝুলনযাত্রা দর্শন করতে বহু মানুষের সমাগম হয়। প্রতিদিনই অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা থাকে।

ঝুলনের পাঁচ দিন সন্ধ্যারতির পর শাস্ত্রীয় সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের আসর বসে ঠাকুরবাড়ির নাটমন্দিরে। অতীতে যদু ভট্ট, অঘোর চক্রবর্তী, রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী, গিরিশ ভট্টাচার্য, লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী প্রমুখ প্রথিতযশা শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করেছেন। সেই ধারা আজও অব্যাহত আছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীদের সুরের মূর্ছনায় ঝুলনের পাঁচদিন রামকানাই অধিকারীর ঠাকুরবাড়িতে এক সাংগীতক পরিমণ্ডল তৈরি হয়, যা সংগীত রসিক শ্রোতাদের মোহিত করে রাখে।

পাঁচদিন ব্যাপী ঝুলনযাত্রা ৮ আগস্ট শুরু হয়ে পরিসমাপ্তি হবে ১২ আগস্ট। এবারও যথারীতি মজলিশ বসবে ঠাকুরবাড়ির নাটমন্দিরে। সংগীত পিপাসু শ্রোতারা স্বাগত। □

ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেবাধর্মের দীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন

শ্রীশ্রী শান্তিকালী মহারাজ

বনমালী দাস

শ্রীশ্রী শান্তিকালী মহারাজ ১৩ জুন ১৯৬০ সালে (৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ) সারুম মহকুমার মনুবাজার অঞ্চলের ফুলছরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মা-বাবার অষ্টম সন্তান। পিতা ধনঞ্জয় ত্রিপুরা ও মাতা খঞ্জনা দেবী। বাল্যকালে নাম ছিল শান্তি। ধনঞ্জয় ও খঞ্জনা দেবীর বেশিরভাগ সন্তান অল্প বয়সে মারা যায়। যার ফলে তাঁদের সপ্তম সন্তান বিরীশের দীর্ঘায়ু কামনায় পায়ে হেঁটে বাংলাদেশের চট্টেশ্বরী পাহাড়ে চন্দ্রনাথ শিব তীর্থ দর্শনে রওনা দিলেন। ফুলছরী গ্রাম থেকে চটেশ্বরী পাহাড়ের দূরত্ব অনেক। রাত্রিবেলা এক গৃহস্থের বাড়িতে রাত কাটিয়ে পরের দিন দুপুরে চটেশ্বরী পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছান।

চটেশ্বরী পাহাড়ের উপর বাবা চন্দ্রনাথ শিবমন্দিরে পৌঁছতে ৮০০ থেকে ১২০০টি সিঁড়ি চড়তে হয়। ক্লান্ত শরীরে ৩০০টি সিঁড়ি ওঠার পর খঞ্জনা দেবী আর উঠতে পারছিলেন না। তাই একটু বিশ্রাম করার জন্য বসেছিলেন। শরীর খুবই খারাপ লাগছিল, পা দুটি যেন অচল হয়ে পড়েছে। খঞ্জনা দেবী প্রার্থনা করতে লাগলেন, 'হে বাবা চন্দ্রনাথ, তুমি আমাকে দর্শনের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করো না, আমাকে শক্তি দাও, যেন তোমায় দর্শন করতে পারি। ঠিক তখনই জটাধারী সাধুবাবা পাহাড়ের উ পর থেকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসছিলেন। সাধুবাবা খঞ্জনা দেবীকে বললেন, 'হে মা, এখনও আরও অর্ধেকের বেশি সিঁড়ি চড়তে হবে। তোমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। তাই তুমি এই স্থানেই তোমার নৈবেদ্যগুলি নিয়ে পূজা দিয়ে দাও। বাবা চন্দ্রনাথ সর্বত্রই বিরাজমান। এখানে বসে পূজা দিলেও তিনি গ্রহণ করবেন।' এই বলে সাধুবাবা সেখানেই পূজার সমস্ত নিয়মানুসারে পূজা শুরু করে দিলেন। পূজা শেষে সাধুবাবা খঞ্জনা দেবীকে বললেন, তোমার একটি পুত্র সন্তান হবে। সে বহু মানুষকে উদ্ধার করবে। আর তোমার যে

ছেলেটি এখনো ঠিক ভাবে কথা বলতে পারেনি সেও আর পাঁচজনের মতো কথা বলতে পারবে।

এরপর মাঝেমধ্যে শিব স্বপ্নে দেখা দিয়ে খঞ্জনা দেবীকে বলতেন আমি তোর ঘরে আসছি। গ্রামের ধাইমা খঞ্জনা দেবীর পেটে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন পেটে বাচ্চা নড়াচড়া করছে। ধনঞ্জয়কে ধাইমা বললেন, সাধুবাবার কথামতো তোমাদের ঘরে কোনো মহাপুরুষের আগমন ঘটছে। চলছে আকাশে মেঘের আনাগোনা ও গর্জন। মধ্যরাত্রিতে খঞ্জনা দেবী ফুটফুটে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। গ্রামের অনেকেই তুলনা করলেন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সঙ্গে। ইনিই পরবর্তীকালে শান্তিকালী মহারাজ নামে খ্যাত হলেন।

শান্তিকালী মহারাজ ছিলেন একজন জন্মসিদ্ধ মহাসাধক। মহারাজের গায়ের রং ছিল ফর্সা। পরতেন বাঙ্গালি বধূর মতো শাড়ি। শুদ্ধ বাংলা বলতেন। দেখলেই মনে হতো কোনো দৈবশক্তি তাঁর দেহে কাজ করছে। তাঁর প্রিয় শিষ্য সন্ন্যাসী চিত্ত মহারাজ। শান্তিকালী মহারাজ ছিলেন 'ভোলানাথের মানস সন্তান'। তিনি বলেছিলেন, 'কলির মানুষের মধ্যে বিশ্বাস কম। বিশ্বাস ও ভক্তি কম থাকার কারণেই ত্রিপুরার মানুষের নৈতিক অধঃপতন ঘটছে।' দেহত্যাগের চার বছর আগে তিনি বলেছিলেন, 'কলির মানুষরূপী অসুরেরা আমার রক্ত পান করতে চায়। আমাকে হত্যা না করলে তাদের মন শান্ত হবে না।' তার ঠিক চার বছর পর ২০০০ সালের ২৭ আগস্ট কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে আততায়ীর গুলিতে তিনি নিহত হন। শ্রীশ্রী শান্তিকালী মহারাজের দেহ নষ্ট করে দেওয়ার পর থেকে ক্রমান্বয়ে ত্রিপুরায় হত্যা, অপহরণ ইত্যাদির মতো অপরাধ ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ১৯৮৯ সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সভায় শান্তিকালী মহারাজ আমন্ত্রিত হন। কেন্দ্রীয় মার্গদর্শন মণ্ডলীর আজীবন সদস্য ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন রামকৃষ্ণ সেবামন্দির ও মঠ। স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন ভারত সেবাশ্রম।

শ্রীশ্রী শান্তিকালী মহারাজ অল্প বয়সেই অনুভব করলেন যে, সনাতনী জনজাতি সমাজ বিভিন্ন ভাবে প্রলোভনে পড়ে নিজেদের উৎস ও ইতিহাস ভুলে গিয়ে পথভ্রষ্ট ও ধর্মান্তরিত হচ্ছে। উপজাতি সমাজকে রক্ষা করার জন্য তিনি গ্রামেগঞ্জে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করলেন। বর্তমানে তাঁর নামে ত্রিপুরার গ্রামেগঞ্জে ২৪টি সেবা আশ্রম ও মন্দির আছে। সেবা আশ্রমগুলোর মাধ্যমে সমাজের মানুষ উপকৃত হচ্ছেন।

অমরপুর বাজার থেকে ১২ কিলোমিটার দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী শান্তিকালী আশ্রম। এই আশ্রমের দেবীগণ হলেন শ্রীশ্রী মা মাতঙ্গী ও শ্রীশ্রী মা ধূমাবতী। এছাড়াও অমরপুর বাজার থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে সরবংস্থিত শান্তিকালী আশ্রমে প্রায় ২৩০ জন উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীর আবাসিক ব্যবস্থা আছে। ওই স্থানে প্রায় ৬ কোটি টাকা খরচ করে তৈরি হচ্ছে শান্তিকালী মহারাজের এক অত্যাধুনিক মন্দির। দর্শনার্থীদের জন্য মন্দিরটির দ্বার খুলে দেওয়া হবে ২০২২ সালের ২৭ আগস্ট। উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। এই আশ্রমের মাধ্যমে প্রতি বছর ১১ জন অনাথ শিশুকে বহিঃরাজ্যে শিক্ষার জন্য পাঠানো হয়।

লক্ষ লক্ষ চাকরিপ্রার্থীর চোখের জলের মূল্য চোকাতেই হবে

অতনু দাস

তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) জাল কেটে বেরোতে পারলেন না প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। গত ২২ জুলাই সকাল থেকে টানা ২৭ ঘণ্টা জেরার পরে গ্রেপ্তার করা হলো তাকে। শুধু তাকে গ্রেপ্তারিই নয়, তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী অভিনেত্রী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার হলো বিপুল পরিমাণ টাকা (প্রায় ২২ কোটি টাকা, ৭৯ লক্ষ টাকার অলংকার ও বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা যার মূল্য প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা)। অভিনেত্রীর বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাট থেকেও পাওয়া গেছে তিরিশ কোটি। এছাড়াও উদ্ধার হয়েছে কুড়িটি সেল ফোন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতির ইতিহাসে এই ঘটনা শুধুমাত্র বিরল নয়, বিরলতম। মনে করা হচ্ছে এই টাকা বিগত দিনে পার্থ চট্টোপাধ্যায় শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন এসএসসি টেট-সহ চাকরি নিয়োগের ক্ষেত্রে যে বিপুল পরিমাণ আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে তারই একটি অংশ মাত্র। তবে বিশিষ্ট জনদের মতে যে পরিমাণ দুর্নীতি ও আর্থিক তছরূপ হয়েছে সেই তুলনায় অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে প্রাপ্ত অর্থ যৎসামান্য। আরও অনেক কিছুই এখনো অন্ধকারে।

প্রশ্ন উঠে গেছে, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসক দলের ও সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে। দিনের পর দিন চাকরি প্রার্থীরা কলকাতার রাস্তায় বসে চোখের জল ফেলছে, কারোর বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা-মা, কারো বাড়িতে স্ত্রী-সন্তান, কিন্তু বাধ্য হয়ে তাদের রাস্তায় পড়ে থেকে আন্দোলন করতে হয়েছে। এই দুঃসহ যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে অনেকেই বেছে নিয়েছে আত্মহননের পথ। লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক- যুবতীর আর্তনাদ, কর্মসংস্থানের দাবি চোখে পড়েনি বর্তমান শাসকদলের, রাজ্য সরকারের? যেন ব্যাপারটা তাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। কত ঘটনাই তো রাজ্যজুড়ে ঘটে, এ আর নতুন কী! এমনই একটা হাবভাব তাদের। অথচ বিগত ১১ বছর ধরে একটা নিয়োগ প্রক্রিয়াও স্বচ্ছ ভাবে ও সততার সঙ্গে করতে পারেনি বর্তমান রাজ্য সরকার। তাদের বিন্দুমাত্র লজ্জাও নেই করতে না পারার জন্য। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তারি ও তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর ফ্ল্যাট থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ উদ্ধার শুধুমাত্র কাকতালীয় একটি ঘটনা কি? মোটেও নয়। শুধুমাত্র পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের একার পক্ষে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপক দুর্নীতি ঘটানো সম্ভব কি? এই প্রশ্নটা আজকে সব মহলে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় হিমশৈলের চূড়ামাত্র। এর গভীরে ঢুকলে দেখা যাবে আরও অনেক কেষ্ট বিষ্টু এর সঙ্গে জড়িত। যে দলে দলনেত্রীর অঙ্গুলিহেলন ছাড়া একটা পাতাও নড়ে না; বুথ থেকে শুরু করে রাজ্যস্তর পর্যন্ত দলের নেতা-মন্ত্রী-সান্ত্রিরা দলনেত্রীর অনুপ্রেরণা ছাড়া এক পাও ফেলেন না সেখানে দলের এবং সরকারের অঘোষিত ভাবে দ্বিতীয় ব্যক্তি (অভিষেকের উত্থানের আগে পর্যন্ত) কীভাবে নেত্রীর নাকের ডগায় এত বড়ো দুর্নীতি করে গেল— স্বাভাবিকভাবেই তা প্রশ্নের সম্মুখীন।

> অর্থের কাছে হার মানল মেধা, ছিনিমিনি খেলা হলো পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ নিয়ে— খুঁজে বের করতে হবে দোষীদের।

শুধু কি কোটি কোটি টাকা এবং বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি উদ্ধার হয়েছে পার্থ ঘনিষ্ঠ অর্পিতার বাড়ি থেকে!! নাকতলা এলাকায় তার প্রোমোটাররাজের কথা দলের কাছে কি গোপন ছিল? কুড়ি বছর আগে যে পার্থ

ফ ঃ ৫

চট্টোপাধ্যায়কে নাকতলা এলাকার কেউই তেমনভাবে চিনত না, কুড়ি বছরের মধ্যে তিনি সেই এলাকার বেতাজ বাদশায় পরিণত হয়েছেন। জমি, বাড়ি থেকে শুরু করে ফ্ল্যাট, দোকান যে কোনো বিষয়ে তিনি তার সাগরেদ প্রোমোটারদের দিয়ে এলাকায় দখলদারি কায়েম করে রেখেছেন। এই এলাকায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে এক ভয়ংকর সিন্ডিকেট রাজ। এলাকার সব প্রোমোটার এবং কন্ট্রাক্টারের দল ঘিরে রেখেছে মন্ত্রীর চারপাশ। ফ্ল্যাটের বিলিবণ্টন নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগও পার্থবাবুর ঘনিষ্ঠ প্রোমোটারদের নামে অনেকবার উঠেছে। নাকতলা এলাকায় কেউ যদি কোনো ফ্ল্যাট কিনতে চায় তাহলে সেই ব্যক্তি ফ্ল্যাট দেখে প্রোমোটারকে টাকা দিয়ে দিল, রেজিস্ট্রার এনে রেজিস্ট্রি হলো কিন্তু ফ্ল্যাটে ঢোকার সময় দেখল রেজিস্ট্রেশন হয়ে গিয়েছে অন্য লোকের নামে। যে ফ্ল্যাটটি তাকে দেওয়া হয়েছে সেটি অপেক্ষাকৃত খারাপ ফ্ল্যাট কিংবা এমন একটা ফ্লোরে যা পুরসভার চোখে বেআইনি। ছাদ হয়তো ভেঙে দিয়ে গিয়েছে পুরসভা থেকে। সেই ব্যক্তির মাথায় হাত পড়তে বাধ্য। সবই চলে মন্ত্রীর নাকের ডগায়। তার অজানাও নয় কোনো বিষয়। কিন্তু এই সমস্ত প্রোমোটার কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে প্রতিদিন তার কাছে বখরা যায়। এলাকার পুরনো বাসিন্দাদের মনে দীর্ঘদিনের প্রশ্ন কীভাবে নাকতলা উদয়ন সঙ্ঘ এত জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে কোটি কোটি টাকা খরচা করে পুজোর আয়োজন করে?

এই প্রশ্ন আশেপাশের ক্লাবগুলোরও। একটু কান পাতলেই শোনা যায় পার্থ চ্যাটার্জি কীভাবে তার মন্ত্রিত্বের প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্ন শিল্পপতি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করেন। নামে বেনামে বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনদের নামে এমনকী নিজের পোষ্য কুকুরদের নামেও বিলাসবহুল ফ্ল্যাট, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার প্রপার্টি কি গোপন ছিল দলের অন্দরমহলের কাছে! শান্তিনিকেতনে একাধিক বাংলো, মেদিনীপুরের পিংলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রীর নামে আন্তর্জাতিক মানের স্কুল। এসব কি কিছুই চোখে পড়েনি সততার প্রতিমূর্তির? যাকে দলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির মাথায় বসিয়ে রাখা হয়েছে, দলের মুখ্য সচেতক করা হয়েছে, যিনি ২০০৬ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা। ২০১১ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীপদ। ম্যাডাম কি জানতেন না তার ক্যাবিনেটের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর কেচ্ছা কেলেঙ্কারির কথা! শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী থাকাকালীন নিজের পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে একাধিক বেনিয়মের অভিযোগ উঠছে পার্থ চ্যাটার্জির বিরুদ্ধে।

২০১৩ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রেশন করে মাত্র এক বছরের মধ্যেই ২০১৪ সালে পিএইচডি ডিগ্রি পেয়েছিলেন পার্থ। ইউজিসি নিয়ম অনুসারে একজন গবেষককে গবেষণার বিষয়ে ন্যূনতম দু'বছর কাজ করতেই হবে। অথচ তৎকালীন উপাচার্যের বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে মাত্র এক বছরের মধ্যেই গবেষণাপত্র জমা দিয়েছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। নিয়ম ভেঙে কেন তাকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, তার উত্তর আজও মেলেনি। গবেষণা করতে হলে রিসার্চ এলিজিবিলিটি টেস্ট পাশ করা এবং ছ' মাসের কোর্স ওয়ার্ক করা বাধ্যতামূলক। কাগজে-কলমে ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে অর্থনীতি বিভাগের অধীনে কোর্সওয়ার্ক করেছিলেন পার্থবাবু। কোর্স ওয়ার্কের ক্ষেত্রে ছ' মাস পূর্ণ সময়ের জন্য ক্যাম্পাসে এসে ক্লাস করার কথা একজন ছাত্রের। সে সময় পার্থ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন পূর্ণ সময়ের মন্ত্রী। কোনোদিন তাকে ক্লাস করতে দেখেননি কেউই। তা সত্ত্বেও তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হয়নি। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সুপারভাইজার ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক অনিল ভুঁইমালি। তাকে পরবর্তীকালে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করা হয়েছিল যা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন রয়েছে শিক্ষা মহলে। যে সময় পার্থ চট্টোপাধ্যায় ডিগ্রি পেয়েছিলেন সেই সময় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপিকা ছিলেন সঞ্চারী রায় মুখোপাধ্যায়। বর্তমানে তিনি দক্ষিণ দিনাজপুর ও রায়গঞ্জ দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বে রয়েছেন। অর্থাৎ ঘটনা পরম্পরা থেকে দেখা যাচ্ছে নিজের প্রভাব খাটিয়ে তিনি কিছু অধ্যাপক অধ্যাপিকাকে দিয়ে নিজের ডিগ্রি হাসিল করেছিলেন এবং পুরস্কার স্বরূপ তাঁদেরও বিভিন্ন উচ্চপদে আসীন করেছিলেন। দুর্গাপুরের বাসিন্দা মোনালিসা দাস বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের ছাত্রী ছিলেন। ২০১২ সালে পার্থবাবুর শান্তিনিকেতনে যাতায়াত বেড়ে যায়। মোনালিসাকে আসানসোলের একটি কলেজে অধ্যাপিকা হিসেবে কাজে ঢুকিয়ে দেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মোনালিসা দাসের সঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্ক নিয়েও উঠছে একাধিক প্রশ্ন। তখন থেকে মোনালিসা শান্তিনিকেতনে একের পর এক বাড়ি কিনতে শুরু করেন। ২০১৬ সালে অর্পিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের, কিছুটা হলেও দূরত্ব তৈরি হয় মোনালিসা দাসের।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বেপরোয়া জীবন, নামে বেনামে প্রচুর সম্পত্তি শুধুমাত্র তার দিকেই প্রশ্ন চিহ্ন তুলে দিচ্ছে না, প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে তার দলের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও। বিগত ১১ বছরে কী পরিমাণ দুর্নীতির শিকড় পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে, সরকারের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করেছে— এটি তারই একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। এই দুর্নীতির পেছনে কাজ করছে আরও অনেক বড়ো বড়ো মাথা, তাদেরও অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সামনে খুলে দিতে হবে তাদেরও মুখোশ। এটাই এই বঙ্গপ্রদেশের সাধারণ মানুষের, সুশীল সমাজের, বেকার যুব সমাজের, ছাত্র সমাজের, চাকুরি প্রার্থীদের, বিদ্বজ্জনদের দাবি। যাদের জীবন থেকে কেড়ে নেওয়া হলো মূল্যবান সময়গুলি, যে সমস্ত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর জীবন নষ্ট করে দেওয়া হলো, অর্থের কাছে হার মানল মেধা, ছিনিমিনি খেলা হলো পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ নিয়ে— যারা এই কাজ করেছে তারা যেন কেউ ছাড় না পায়। কঠোর থেকে কঠোরতম, দৃষ্টান্তমূলক সাজা সকলেরই কাম্য।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই বঙ্গের যুব সমাজের চোখের জল বৃথা যাবে না। চোখের জলের মূল্য চোকাতেই হবে তাদের। ▫

আশা দেখাচ্ছে হাতির পাল

কৌশিক রায়

মানুষের অনুপ্রবেশ এবং পরিবেশ দূষণ ক্রমশই বেড়ে চলেছে। এর ফলে নিজেদের বাসস্থান ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে বহু পশুপাখি। অনেক সময়েই মানুষের আগ্রাসন এবং হিংস্রতার অসহায় শিকার হচ্ছে তারা। মানুষের এই অহেতুক অধিকার এবং হিংসাবৃত্তির বিরুদ্ধে আশা জাগিয়েছে ছত্তিশগড়ের সীমানা পেরিয়ে পূর্ব মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলি এলাকার জঙ্গলে প্রবেশ করা ২২টি ছোটো বড়ো হাতির একটি দল। গত বছর এর ১৮ অক্টোবর থেকেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই হাতির দল। এই হাতিগুলিকে পুনর্বাসিত করতে পারলে ভারতে হাতির সংখ্যা অনেকটাই বেড়ে যাবে বলে প্রাণীবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন।

ছত্তিশগড়ের সীমানা থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কাঁহারগাঁও টোলা গ্রাম। সেখান দিয়েই মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে এই হাতির পালটি। ফসল এবং মানব-বসতির তেমন একটা ক্ষতি করেনি এই হাতিগুলি। সাধারণত কচি বাঁশের পাতা খেয়েই এরা ক্ষুধানিবৃত্তি করছে। এছাড়া চিরোঞ্জি বা চারোলি নামে আরেকটি খাদ্যযোগ্য বীজও খায় হাতিরা। তারা যে গড়চিরোলি অরণ্যে ঘোরাঘুরি করছে তার ৭৫ শতাংশই সংরক্ষিত অরণ্যের মধ্যে পড়ে। এই হাতির পাল এখানে আসার আগে ৮-৯ বছর ধরে দক্ষিণ ভারতেও ঘোরাঘুরি করেছিল। চাপরালা, প্রাণহিতা, কোলমার্কা, ভামরাগড় প্রভৃতি সংরক্ষিত অরণ্যেও ঘুরতে দেখা গেছে এই হাতির পালকে। ২০১৩ সালে এই হাতির পালটিকে দেখা যায় ওড়িশা রাজ্যে। তারপর ছত্তিশগড়ের অন্তর্গত কাংকের, বালোদ, গারিয়াবান্দ ও ধামতারিতে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে এই হাতির পালটিকে। মহারাষ্ট্রের বনদপ্তরের কর্মী ও আধিকারিকরা এই হাতির পালের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো শাবক এবং সন্তানসম্ভবা মায়েদের দিকে লক্ষ্য রেখে চলেছেন। এখন উত্তর গড়চিরোলির অন্তর্গত ধানোরা ও মুরুমগাঁওতে এই হাতির পালটি ঘুরে বেড়াচ্ছে। এছাড়া পোরলা, হোলসা ও কাঁহারগাঁওতেও দেখা গেছে এই হাতির পালকে। অবশ্য, স্থানীয় জনজাতির মানুষরা এই হাতির পালকে অনেকটাই ভয় পাচ্ছেন। কারণ হাতি নিয়ে আগের অভিজ্ঞতা তাদের ততটা মধুর নয়।

ওয়েনগঙ্গা নদী তীরবর্তী চন্দ্রপুর জোলর অন্তর্গত ব্রহ্মপুরী নামক স্থানে এই হাতির পাল গত ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি নাগাদ প্রবেশ করেছিল। তাদোবা-আন্ধারি ব্যাঘ্র সংরক্ষণ অঞ্চলের দিকেও যেতে পারে এই হাতির পাল। স্থানীয় জনজাতিরা অবশ্য এই হাতির পালের জন্য জঙ্গলে মধু, কাঠ ও গাছের পাতা কুড়োতে যেতে ভয় পাচ্ছেন। দুই প্রাণীবিশেষজ্ঞ— প্রাচী মেহতা ও জয়ন্ত কুলকার্নি জানিয়েছেন, ২০০২ সাল থেকেই মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বুনো হাতির অনুপ্রবেশ বেড়ে চলেছে। এই হাতির বেশিরভাগটাই আসছে কর্ণাটকের দিন্দিগুল অরণ্যাঞ্চল থেকে। ১১টি হাতিকে মহারাষ্ট্রের কোলহাপুর ও সিন্ধুদুর্গ জেলাতে ঘুরোঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে। এছাড়া, সাতপুরা ফাউন্ডেশন নামক একটি পরিবেশ সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে— মহারাষ্ট্রে বিদর্ভ থেকেও বেশ কিছু হাতি এসেছে। বুনো মোষেদেরকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ওড়িশার সুনাবেদা ও খারিয়ার, ছত্তিশগড়ের সিতান্দি ও উদ্দান্তি এবং তেলেঙ্গানা উত্তরে ভদ্রাচলম্ নামক এলকাগুলিতেও। আশা করা যায়, বুনো হাতি আর বুনো মোষদের জন্য আরও কয়েকটি নতুন অভয়ারণ্য গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এতে পরিবেশের ভারসাম্য অনেকখানি ফিরবে বলে আশা করছেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরা। ▫

দক্ষিণী ছবির সাফল্যে বলিউডে ডি-কোম্পানির দাপট কমতে পারে

মনোজিৎ সরকার

‘তেরি ঝলক আশারফি শ্রীভাল্লি’— কয়েক মাস আগে গুঞ্জরিত সঙ্গে ‘ও ওন্টাভা মাভা’ আসমুদ্র হিমাচল মুখে মুখে ফিরছে যে ফিল্মের গান তার নাম ‘পুষ্পা’, সুপার ডুপার হিট ফিল্ম। কোভিডের পর যখন গোটা বিশ্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি গভীর সংকটে আচ্ছন্ন ছিল সেই বাজারে প্রায় স্তব্ধ বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করল দক্ষিণ ভারতীয় প্রযোজনায় ফিল্ম ‘পুষ্পা’, ‘কেজিএফ-২’, ‘আর আর আর’, যা বাদ বাকি বলিউডের ছায়াছবিকে অনেকটাই পিছনে ফেলে দিয়েছে।

কোভিডের আগে ২০১৫-তে ‘বাহুবলী’ ফিল্মটি ভারতীয় ফিল্মের দর্শকদের রীতিমতো নাড়িয়ে দিয়েছিল। বাজার চলতি সেট সেটিং, গল্পবলার ঢং— ধারণাকে আমূল বদলে তার সঙ্গে ভিজুয়াল এফেক্টস-এর সাহায্যে এক নয়া চমক তৈরি করে দর্শককে পুনরায় হলমুখী করেছে।

পরিচালক প্রশান্থ নীল, কেজিএফ-এর এক ও দুই তৈরি করেন অ্যাকশন ফিল্মের নিপুণ মোড়কে। রবিনহুড বা রঘু ডাকাতের আদলে রকি চরিত্রটি কোলারে সোনার খনির গ্যাংস্টারদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে কীভাবে মোকাবিলা করলেন, তেমনই ‘আর আর আর’ ফিল্মটি দেশভক্তির এবং পুরোনো বাহুবলীর আদলকে কাজে লাগিয়ে সঙ্গে রূপকথার বিচিত্র মিশ্রণ দর্শককে তিন ঘণ্টা টানটান উত্তেজনায় উদ্বেল করেছে।

কেমন করল এইসব ফিল্মগুলোর ব্যবসা? কোভিড অতিমারির ঠিক পরেই আল্লু অর্জুন অভিনীত ‘পুষ্পা দ্য রাইজ’ রামচরণ অভিনীত ‘আর আর আর’, ইয়াস অভিনীত ‘কেজিএফ-২’ বক্স অফিসের রোজগার ঊর্ধ্বমুখী করেছে। তুলনায় সম্প্রতি ‘সম্রাট পৃথ্বীরাজ’ অক্ষয় কুমারের অভিনয়ে প্রথম নয় দিনে মাত্র ৫৯ কোটি টাকা তুলেছে। কঙ্গনা রানাওয়াতের ‘ধাক্কাড়’ মাত্র সাড়ে চার কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। যদিও বিবেক অগ্নিহোত্রীর ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’, ‘গাঙ্গুবাই কাঠিয়াবাওয়াড়ী’ জাতীয় ছবিগুলি মন্দ ব্যবসা করেনি। এর মধ্যে কমল হাসানের ‘বিক্রম’ বিশ্বব্যাপী সমস্ত ভাষায় মাত্র আটদিনে ২৫০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে।

অতি সম্প্রতি ফিল্মের (ভারতীয়) সামগ্রিক এক বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে দক্ষিণে তেলুগু, তামিল, কন্নড় এবং মালায়লাম ভাষায় তৈরি ছবিগুলি গড়পড়তা একটি লাভজনক ব্যবসার

ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। একটি দক্ষিণী ভাষার হিট প্রথমে সব ক'টি দক্ষিণের ভাষায় ডাবিং করে বলে পরবর্তীতে হিন্দিতেও ডাব করে চালিয়ে সুপার ডুপার হিট ব্যবসা করেছে। অতীতে ফিল্ম 'রোজা', 'বম্বে' স্মরণ করুন দর্শক। দেশীয় প্রেক্ষাপটে দক্ষিণী চরিত্র দর্শকমনে প্রভাব বিস্তার করেছে।

অন্যদিকে খানভাইদের প্রভাব অনেকটাই তলানিতে। সাম্প্রতিক অতীতে দক্ষিণের গল্পের হুবহু কপি করে বেশকিছু হিন্দি ছবির বক্স অফিসে লক্ষ্মী বিরাজ করেছে। যেমন 'সিঙ্ঘম', 'রাঠোর', 'বডিগার্ড', 'সূর্যবংশম', 'দয়াবান', 'চাচি ৪২০' 'বিরাসত'— সমেত অসংখ্য ফিল্ম। দক্ষিণের প্রায় সমস্ত প্রয়োজক-পরিচালক এই মুহূর্তে নিজের রাজ্যের পাশাপাশি পাকাপাকি ভাবে মুম্বইতেও অফিস খুলেছে। অঢেল তাদের লগ্নি। এই লগ্নির জন্য অতীতে বলিউড ইন্ডাস্ট্রি অনেকটাই তাকিয়ে থাকত মাফিয়াদের দিক।

প্রশ্ন উঠছে বলিউডে দক্ষিণের লগ্নি আরও বাড়লে কি ডি-কোম্পানির দাপট কমবে? হিন্দি সিনেমাকে বাঁচাতে হলে বলিউডে মাফিয়া ডনদের দৌরাত্ম্য কমাতেই হবে। এমনিতেই হিন্দি সিনেমা এক জগাখিচুড়ি সংস্কৃতির আধার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখনকার মূলধারার হিন্দি ছবি দেখলে মনে হয় এই ছবি ভারতীয় নয়। আরব পাকিস্তান আমেরিকা মিলেমিশে এক গোলমেলে ফিউশনের চেহারা নিয়েছে হিন্দি ছবি। এই পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণের প্রযোজক-পরিচালকেরা যদি হিন্দি ছবিতে ভারতীয় স্বাদগন্ধ আনতে পারেন তাহলে তা সত্যিই আখেরে কাজে দেবে। ডামাডোল পেরিয়ে বেঁচে যাবে বলিউড। □

ভারতীয় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এখন দক্ষিণমুখী

বলিউডের খান, কাপুর, সিংহদের এখন টেক্কা দিচ্ছেন দক্ষিণী ফিল্মের নায়করা। প্রভাস, আল্লু অর্জুন, রামচরণ, জুনিয়র এনটিআর যশদের ছবি রিলিজ হওয়া মানেই বক্স অফিসে বড়ো সাফল্য। অ্যাকশনে ভরপুর। স্পেশ্যাল এফেক্টেস-এর অ্যাপ্লিকেশন এবং সর্বোপরি ফিল্মের স্বতন্ত্র গল্প সারা দেশে দক্ষিণী ফিল্মের চাহিদা ব্যাপক বাড়িয়ে দিয়েছে। হালফিলের মুভি চ্যানেলগুলোর ১০ টার মধ্যে ৬টা চ্যানেলেই দক্ষিণী ফিল্ম টেলিকাস্ট হয়। দেশব্যাপী এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমা।

২০১৫ সালে রিলিজ হওয়া 'বাহুবলী'র পর থেকে মানুষের দক্ষিণী ফিল্মের প্রতি আগ্রহ আরও বেড়েছে। এসএস রাজা মৌলি পরিচালিত এই সিনেমাটি বক্স অফিসে এ যাবৎ সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দেয়। ২০১৭ সালে রিলিজ হলো 'বাহুবলী-২'। এই ফিল্মটি আবার 'বাহুবলী'র বক্স অফিস সংগ্রহের রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড তৈরি করে। ২৬টি দেশে এই ফিল্মটি মুক্তি পেয়েছিল।

২০১৮ সালে বক্স অফিস দখল করল কেজিএফ। তারপর একে একে 'পুষ্পা : দ্য রাইজ', 'আর আর আর' এবং 'কেজিএফ : চ্যাপ্টার-২'। সবকটা মুভিই বক্স অফিস ছিট। ভারতের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কেন্দ্র এখন মুম্বই থেকে দক্ষিণ ভারতমুখী। দক্ষিণী চলচ্চিত্রের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের দিকে তাকিয়ে বলিউডের বহু প্রতিষ্ঠিত তারকা এখন দক্ষিণের ইন্ডাস্ট্রির দিকে ঝুঁকছেন।

বক্স অফিসে সফল কয়েকটি দক্ষিণী ফিল্মের তালিকা

ফিল্ম	বছর	পরিচালক	ভাষা	বিশ্বব্যাপী সংগ্রহ (কোটি হিসেবে)
বাহুবলী : দ্য বিগিনিং	২০১৫	এসএস রাজামৌলি	তেলুগু	৬৫০
সাহো	২০১৯	সুজিত	তেলুগু	৪৩৩.০৬
বাহুবলী-২	২০১৭	এসএস রাজামৌলি	তেলুগু, তামিল	১৮১০
২.০	২০১৮	শঙ্কর	তামিল	৮০০
বিগিল	২০১৯	অ্যাটলি	তেলুগু	৩০০
পুষ্পা : দ্য রাইজ	২০২১	সুকুমার	তেলুগু	৩৬৫
কেজিএফ-২	২০২২	প্রশান্থ নীল	তামিল, কন্নড়	১১৯৮
আর আর আর	২০২২	এসএস রাজামৌলি	তেলুগু, তামিল মালায়ালম	১১১১.১০

পঞ্চমুখী হনুমান

ছোটো বন্ধুরা, তোমরা কোথাও কোথাও পঞ্চমুখী হনুমানের বিগ্রহ দেখতে পাবে। অর্থাৎ পাঁচ মুখের হনুমান। হনুমান একবার পাঁচ মুখের আকার ধারণ করেছিলেন। শাস্ত্রে আছে, প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে এই পঞ্চমুখী হনুমান বিগ্রহের পুজো করলে নাকি সর্বসিদ্ধি হয়, আত্মবিশ্বাস বাড়ে আর সকল প্রকার বিপদআপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। চিন্তাশক্তির স্বচ্ছতা আসে। সকল কাজে অনুপ্রেরণা জন্মায়।

তবে, কখন বা কেন হনুমান এই পঞ্চমুখী রূপ ধারণ করেছিলেন সে কথাই শোনাবো তোমাদের। সেটা রামায়ণের কথা। একসময় রামচন্দ্র ও ভাই লক্ষ্মণকে কৌশল করে পাতালে বন্দি করে রেখেছিল রাবণের ভাই মহীরাবণ ও অহিরাবণ। এই সংবাদ সর্বপ্রথম পেয়ে যান শ্রীরামচন্দ্রের সবচেয়ে প্রিয়ভক্ত হনুমান। কিন্তু মহীরাবণের বলবিক্রম তো কম নয়। তাকে বধ করতে না পারলে যে পাতাল থেকে রাম-লক্ষ্মণকে উদ্ধার করা যাবে না।

কিন্তু মহীরাবণকে বধ করা সহজ কাজ নয়। তখন হনুমান পঞ্চমুখী রূপ ধারণ করেন। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ ও ঊর্ধ্বে— এই পাঁচদিকে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালিয়ে পাঁচদিকে মুখ করে জ্বলন্ত পাঁচটি প্রদীপকে আবার একই সঙ্গে নিভিয়ে দিয়ে রাক্ষসরাজ রাবণের দুই ভাই মহীরাবণ ও অহিরাবণকে বধ করে রাম-লক্ষ্মণকে উদ্ধার করে আনেন। সেই থেকে বীর হনুমান ভক্তের কাছে পঞ্চমুখী হনুমান নামে পরিচিত হয়ে গেলেন।

হনুমান অত্যন্ত বিদ্বান ও স্থিতধী। সংস্কৃত ভাষা, ব্যাকরণ ও শব্দশাস্ত্রে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত। কথিত আছে,

শ্রীরামচন্দ্রের রাবণ জয়ের পর বীর হনুমান হিমালয়ে গিয়ে কিছুদিন তপস্যা করেন এবং নখ দিয়ে তিনি শ্রীরামচন্দ্রের সমস্ত কীর্তি লিখে 'হনুমৎ রামায়ণ' নামে এক সাহিত্য রচনা করেন। একসময় রামায়ণ রচয়িতা আদিকবি বাল্মীকি সেই রচনার গুণমান দেখে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে যান।

হনুমান এর কারণ জানতে চাইলে মহর্ষি বাল্মীকি বলেন, হনুমৎ রামায়ণ এত উচ্চমানের রচনা যে তাঁর বহু পরিশ্রমে লেখা রামায়ণ সেই তুলায় কিছুই নয়। এমনকী মহর্ষি বাল্মীকি লজ্জিত হয়ে বলেন যে, ভক্তপ্রবর হনুমানের যশোগাথা যা রামায়ণে বর্ণিত হয়নি, তা পূরণ করার জন্য বাল্মীকিকে আরও একবার জন্মগ্রহণ করতে হবে। তাই, অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তির ধারণা যে মহর্ষি বাল্মীকিই পরবর্তী জন্মে গোস্বামী তুলসীদাসজী নামে বিখ্যাত হন।

বিশ্বজিৎ সাহা

ভারতের বিপ্লবী

রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

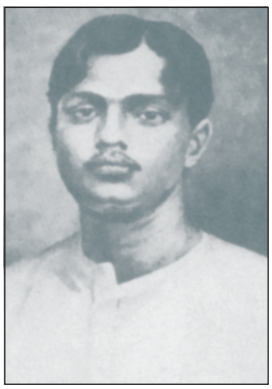

বিপ্লবী রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর জন্ম ১৯০১ সালে পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলার মোহনপুরে। তিনি বাবার কাছেই স্বদেশপ্রেমের দীক্ষা পান। বালক বয়সেই পুলিশের নজরে পড়েন। উচ্চশিক্ষার জন্য বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। এখানেই তিনি বিপ্লবীদলের সংস্পর্শে আসেন। এই সময় আধুনিক বোমা তৈরির কৌশল শেখবার জন্য কলকাতায় আসেন। ১৯২৬ সালে তাঁকে কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় আসামি করে বিচার শুরু হয়। বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ডাদেশ হয়। ১৯২৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশের গোণ্ডা জেলে তাঁর ফাঁসি হয়। ফাঁসির হুকুম রদের জন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করেননি।

জানো কি?

- সিকিম ভারতের একমাত্র রাজ্য যেখানে কোনো রেলস্টেশন নেই।
- ট্রেনের টিকিটে PNR-এর ফুলফর্ম হলো Passenger Name Record.
- ভারতে ৯৬০টি রেলস্টেশন সৌরশক্তি চালিত। প্রথমটি গুয়াহাটি।
- ভারতের দীর্ঘতম রেলস্টেশন গোরক্ষপুর।
- স্বাধীন ভারতে প্রথম রেলমন্ত্রী ছিলেন জন মাথাই।
- মৈত্রী এক্সপ্রেস ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে চলাচল করে।
- ভারতের প্রথম মহিলা ট্রেনচালক সুরেখাশঙ্কর যাদব।

ভালো কথা

জোনাকি

পরীক্ষার পর প্রথম এবার মায়ের সঙ্গে আমি ও ভাই মালবাজারে মামাবাড়ি গেলাম। সেদিন সন্ধ্যায় আমি ও ভাই ছাদে দাঁড়িয়ে চারদিকে গাছপালা দেখছিলাম। হঠাৎ দেখি মাটি থেকে শয়ে শয়ে নীলাভ আলো উঠে গাছে গাছে উড়ে বেড়াতে লাগল। কিছু আবার আমাদের দিকেও উড়ে আসতে লাগল। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। কী করব ভাবছি, তার আগেই ভাই চিৎকার করে কেঁদে উঠল। নীচে থেকে সবাই দৌড়ে এল। সব শুনে মামিমা বললেন ওগুলো তো জোনাকি। ওগুলোকে আবার ভয় কীসের! ওদের পেটের নীচে লুসিফেরিন নামে এক ধরনের রাসায়নিক থাকে। অক্সিজেনের সংস্পর্শে রাসায়নিক বিক্রিয়া হলেই আলো জ্বলে ওঠে। ওই আলো ওদের শক্তি জোগায় এবং খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। পৃথিবীতে দু'হাজার রকমের জোনাকি আছে। শুনে আমি ও ভাই খুব লজ্জা পেয়েছিলাম।

ঈশানী কর্মকার , একাদশশ্রেণী, রাসবিহারী এভিনিউ ,বালিগঞ্জ, কলকাতা-১৯।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ল্লি চ কা ন্দ্র	(১) রি দু হা র জা য়া
(২) লা ছা ত দ	(২) ই প শা ম ত ণ্ডি

১১ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) ক্ষমাপরায়ণ (২) বিচারাধিকার

১১ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) বিপত্তারিণী (২) মদনমোহন

উত্তরদাতার নাম

(১) শ্রেয়সী ঘোষ, সেকেন্দারপুর, অমৃতি, মালদা। (২) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯ (৩) রাকেশ মণ্ডল, কাঁথি, মারিশদা, পূঃ মেদিনীপুর। (৪) অনুপ সিং, সিপাইবাজার, মেদিনীপুর।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

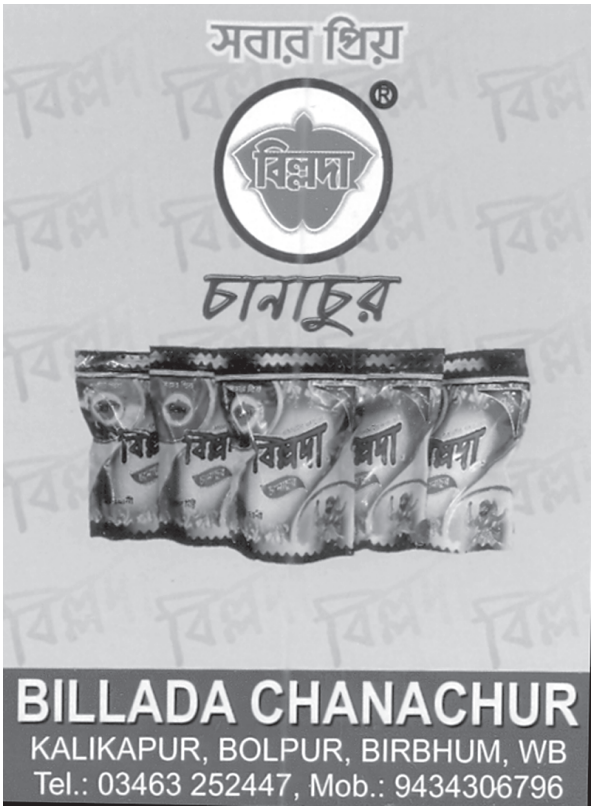

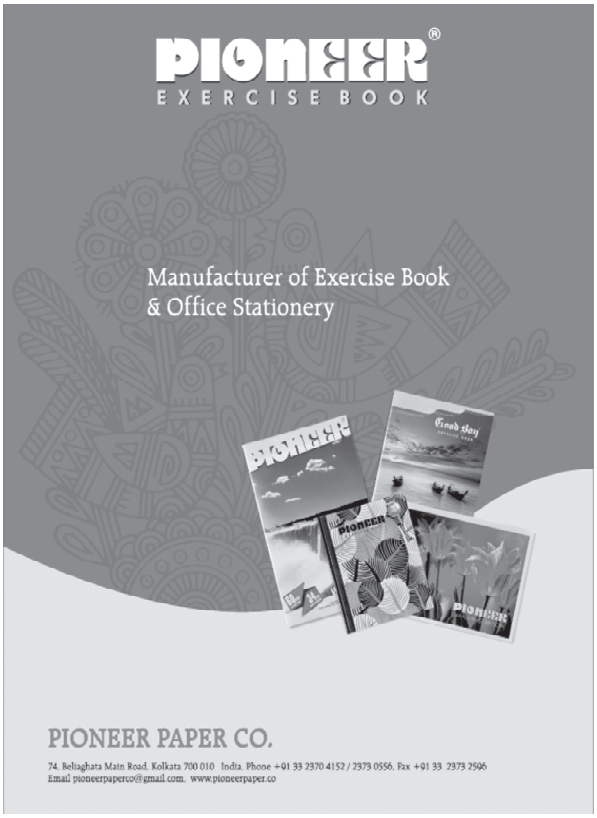

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

বিজেপি চায় না শিবসেনা তলিয়ে যাক

দুর্গাপদ ঘোষ

মহারাষ্ট্র বিধানসভায় গত ৪ জুলাই একনাথ সম্ভাজী শিণ্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা গোষ্ঠী এবং বিজেপি জোট সরকার ১৬৪-৯৯ ভোটের ব্যবধানে আস্থা ভোটে জয়ী হয়েছে। এরপরই উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপির পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ তাঁর ভাষণে ইঙ্গিতপূর্ণ দুটো বাক্য উচ্চারণ করেন, ‘ মহারাষ্ট্রে ফের শিবসেনা-বিজেপির জোট সরকার গঠিত হলো।’ তাঁর ঠিক আগে মুখ্যমন্ত্রী শিণ্ডে তাঁর ভাষণে বলেন, ‘বিজেপির সঙ্গে শিবসেনার সম্পর্ক হলো আগর্শগত এবং এই জোট হলো আদর্শের জোট, স্বাভাবিক জোট।’ রাজনৈতিক পণ্ডিতদের মতে নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ মুখ্যমন্ত্রী দুজনের এই বক্তব্যই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে ফড়নবিশ তাঁর প্রথম বাক্যের মাধ্যমে শিবসেনার বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীকেই প্রকত ‘শিবসেনা’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। একই সঙ্গে শিণ্ডেগোষ্ঠী বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর দ্বিতীয় বাক্যটি দ্ব্যর্থক অথবা অনেকার্থক। ইডি বলতে যেমন একনাথ-দেবেন্দ্র, তেমনই এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটও বোঝায়। মুখ্যত আর্থিক কেলেঙ্কারির তদন্তকারী সংস্থা।

এদিকে উদ্ধব ঠাকরে সরকারিভাবে এখনো শিবসেনার সভাপতি। তিনি এনসিপি এবং কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে মহা আঘাড়ি (জোট) সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর সরকারের পক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিধায়ক নেই বুঝতে পেরে মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু মহা আঘাড়ি ছাড়েননি। ছাড়বেন না বলেও জানিয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি বিধানসভার উপাধ্যক্ষ একনাথ শিণ্ডে-সহ ১৬ জন বিক্ষুব্ধ শিবসেনা বিধায়ককে বেআইনিভাবে দলত্যাগী চিহ্নিত করে তাঁদের সদস্যতা খারিজ বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে শিণ্ডেগোষ্ঠী তাদের সঙ্গে ৩৯ জন অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশের বেশি বিধায়ক আছেন এই যুক্তিতে বিধানসভায় সংখ্যালঘু পক্ষের অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ এটা করতে পারেন না দাবি করে উলটে ওই উপাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত, এই প্রতিবেদন যখন লেখা হচ্ছে তখনো পর্যন্ত এই সমস্ত বিতর্ক ও আইনি কূটকাচালির সমাধান হয়নি। ২০ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট ১ আগস্ট পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করার আগে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে জানিয়েছেন যে কেউ যদি তাঁর দল থেকে বেরিয়ে যেতে চান তাহলে করার কী আছে! এখানে একটা প্রশ্ন থেকে গেছে যে, কোনো দলের জনপ্রতিনিধিদের দুই-তৃতীয়াংশ একসঙ্গে দল ত্যাগ করলে তাঁরাই সেই দলের নাম ও নির্বাচনী প্রতীকের অধিকারী হতে পারেন কিনা, সেটা বস্তুত নির্বাচন কমিশনের বিচার্য বিষয়।

শিণ্ডে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি বিধায়ক নিয়ে পৃথক হয়েছেন। বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার গড়েছেন। আস্থাভোটে জয়ীও হয়েছেন। কিন্তু আলাদা দল গড়েননি। বিজেপিতেও যোগ দেননি। তাহলে উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ কি মুখ ফসকে ভুল বলে ফেলেছেন? দেবেন্দ্রকে যাঁরা চেনেন তাঁরা জানেন তিনি রাজনীতিতে যথেষ্ট দড়। আলগা কথা বলার লোক নন। আসলে সবটাই রণনীতি। ২০ জুন থেকে ২ জুলাই পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে রাজনীতির পারদ ছিল এখনকার চাইতে অনেক বেশি তুঙ্গে। সমর্থক বিধায়কদের নিয়ে গুজরাটের হোটেলে থাকার পর গুয়াহাটির এক হোটেলে অবস্থান করছিলেন শিণ্ডে। সেখান থেকে প্রায় ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে তিনি পালটা শিবসেনা গড়বেন প্রয়াত বাল ঠাকরের নামকে মাথার মণি করে। তাঁর দলের নাম হবে ‘শিবসেনা (বালাসাহেব)’। শোনা যায়, তখন তাঁকে নিরস্ত করেছিলেন ফড়নবিশ। বলেছিলেন, একটু থামো, এখনো সময় আসেনি। আগে দেখো প্রকৃত শিবসেনার কর্তৃত্ব লাভ করতে পারো কিনা। বলেছিলেন,উতলা হয়ে তাড়াহুড়ো করো না। সময়ই শেষ কথা বলবে। সেটাই-বা কেন? দলত্যাগ বিরোধী আইনের ৮ম তপশিল অনুযায়ী কোনো দল থেকে দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত প্রতিনিধি যদি তাঁদের দলনেতার নির্দেশ বা হুইপ না মানেন কিংবা দলের বিরুদ্ধে বা বাইরে চলে যান,

ফঃ ৬

তাহলে হয় তাদের কোনো স্বীকৃত দলের সঙ্গে মিশে যেতে হবে নতুবা পৃথক দল গঠন করে নির্বাচন কমিশনে গিয়ে স্বীকৃতি এবং নির্বাচনী প্রতীক নিতে হবে। অন্য একটি দিকও আছে। বেশিরভাগ সদস্যকে নিয়ে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী মূল দলভুক্তদের বা দলনেতাকেই বহিষ্কার করে দিতে পারেন। দখল করে নিতে পারেন দলের নেতৃত্ব পদ। এক্ষেত্রে এসবের কোনোটাই হয়নি। শিণ্ডেরা দলত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেননি। তাঁদের দলনেতা তাঁদের দল থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছেন। এটা ফড়নবিশ এবং তাঁর মাথার ওপরে থাকা বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, রাজনাথ সিং, জেপি নাড্ডার মতো ঝানু নেতারা জানতেন না বা জানেন না এটা বিশ্বাস করা যায় না। প্রসঙ্গত একটা কথা বলা দরকার। তা হলো বিধানসভায় সরকার পক্ষ সংখ্যালঘু হলে কিংবা বিরোধীদের পক্ষের গরিষ্ঠ সংখ্যক বিধায়ক চলে যাবার পর স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার বিপক্ষের কারও সদস্যতা খারিজ করতে পারেন না। মহারাষ্ট্রে ডেপুটি স্পিকারের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটাই হয়েছে বলে শিণ্ডেগোষ্ঠীর দাবি। তাঁদের বক্তব্য, ডেপুটি স্পিকারের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কের পক্ষ থেকে অনাস্থা প্রকাশ করে মেল পাঠানোর পরে তিনি ১৬ জনের সদস্য পদ খারিজ ঘোষণা করেছেন। মহারাষ্ট্রে প্রায় এক বছর যাবৎ স্পিকার পদ শূন্য ছিল। সেই থেকে এনসিপি বিধায়ক তথা ডেপুটি স্পিকারই স্পিকারের কাজ করে যাচ্ছিলেন। গত ৩ জুলাই বিজেপি এবং শিণ্ডে গোষ্ঠী ছাড়াও রাজ ঠাকরের এমএনএস এবং নির্দল বিধায়কদের সমর্থনে ১৬৪-১০৭ ভোটে স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন বিজেপির রাহুল নার্বেকর।

শিণ্ডেদের একটাই দাবি ছিল, শরদ পওয়ারের দল এনসিপি এবং কংগ্রেসের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে উদ্ধব ঠাকরেকে এবং জোট সরকার করতে হবে বিজেপির সঙ্গে। কেননা শিবসেনার প্রতিষ্ঠাতা বালাসাহেব বরাবরই ছিলেন কংগ্রেস এবং এনসিপির ঘোরতর বিরোধী। কেবল ক্ষমতার জন্য তাঁর দল কংগ্রেস এবং এনসিপির সঙ্গে জোট বাঁধতে পারে না। তাতে প্রয়াত বালাসাহেবের নীতি এবং আত্মার অবমাননা হবে। সেটা হচ্ছে বলেই শিণ্ডেরা এত বড়ো বিদ্রোহটা করেছেন। তাই উদ্ধবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শিণ্ডেরা যখন বেরিয়ে এসেছিলেন চাইলে বিজেপি তখনই তাঁদের বিজেপিতে নিয়ে এককভাবে বিজেপির সরকার গড়তে পারত। শিণ্ডেকে মুখ্যমন্ত্রী করার দুঘণ্টা আগে পর্যন্ত ঠিক ছিল মুখ্যমন্ত্রী হবেন দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, উপমুখ্যমন্ত্রী হবেন শিণ্ডে। এমনকী শিণ্ডেদের কতজনকে মন্ত্রী করা হবে সেটা পর্যন্ত পাকা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এর কোনোটাই চাননি বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তাহলে তাঁদের রণনীতিটা কী?

বিজেপি চায়নি বা এখনো চায় না যে হিন্দুত্ববাদী একটা দল বিলুপ্ত হয়ে যাক কিংবা শিণ্ডেগোষ্ঠী আলাদা নামে কোনো নতুন দল গঠন করুক। কেননা তাতে বিজেপির স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হতে পারে। অভিযোগ উঠতে পারে, টাকা দিয়ে বিধায়ক ভাঙানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে বিজেপির পক্ষে এখন জনসমর্থনের যে জোয়ার এসেছে তার বদলে ভাটার টান দেখা দিতে পারে। শিণ্ডেদের দলভুক্ত না করে এবং একনাথকে মুখমন্ত্রী করে সারা দেশের সামনে বিজেপি যে বার্তা দিতে পেরেছে তা হলো তারা কেবলমাত্র ক্ষমতা দখলের রাজনীতি করে না, নীতির রাজনীতি করে। তা না হলে মহারাষ্ট্রের মতো দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীপদ শিণ্ডেকে ছেড়ে দিত না। এ থেকেই স্পষ্ট যে, মহারাষ্ট্রের বর্তমান রাজনীতির ডামাডোলের জন্য বিজেপি কোনোভাবেই দায়ী নয়। দায়ী মহা বিকাশ আঘাড়ি এবং বালাসাহেবের পুত্র ও পৌত্র উদ্ধব-আদিত্য ঠাকরের নীতিহীনতা ও চূড়ান্ত ক্ষমতা লোভ। লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো, মহারাষ্ট্রের বিজেপি নেতারা এখনো বারবার প্রয়াত বালঠাকরের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে নিয়ে থাকেন। অথচ তাঁরা কিন্তু বালঠাকরের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী নন। উত্তরাধিকারী শিবসেনা। বিজেপি চায় প্রধানত শরদ পওয়ারের খপ্পরে পড়া উদ্ধব ঠাকরের কর্তৃত্বমুক্ত শিবসেনা। শিণ্ডেদেরও মূল লক্ষ্য এটাই। তাঁরাও সোনিয়ার নামে শপথ নেওয়া এবং পওয়ারের কাছে নতি স্বীকার করার ঘোর বিরোধী। 'পওয়ারের অপমান বরদাস্ত করা হবে না' হুংকার ছাড়া নেতাদের তাঁরা চান না। আর স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকরের অপমান হজম করা উদ্ধবের নেতৃত্বও তাঁরা বরদাস্ত করে রাজি নন।

বিজেপি নেতারা আরও চাইছেন, উদ্ধবের কর্তৃত্ব থেকে আরও কিছু বিধায়ক ছাড়াও যে সমস্ত পুর ও পৌরসভা শিবসেনার দখলে আছে কিংবা যেখানে যেখানে জোট করলে বিজেপি ও শিণ্ডেগোষ্ঠী দখল নিতে পারে সেগুলোও কংগ্রেস-এনসিপির জোট থেকে বিজেপি জোটে চলে আসুক। শিবসেনা সাংসদরাও চলে আসুক শিণ্ডের দিকে। সেজন্য প্রথম থেকে বিজেপি তাড়াহুড়ো না করে সময় কাটাতে চাইছে। তাতে ব্যাপক সাফল্যও এসেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই গত ৭ জুলাই মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম পুরসভা ঠানেতে শিবসেনার মোট ৬৭ জন পুরপ্রতিনিধির মধ্যে ৬৬ জনই শিণ্ডের পক্ষে চলে এসেছেন। বৃহত্তম পুরসভা বৃহন্মুম্বাই পুরসভাও টালমাটাল হতে শুরু করেছে। নবি মুম্বই পুরসভার বেশিরভাগ শিবসেনা পার্ষদ (কাউন্সিলার) শিণ্ডের পক্ষে। এমনকী গত ১৮ জুলাই শিবসেনার মোট ১৮ জন লোকসভা সদস্যের মধ্যে ১২ জন স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করে পৃথকভাবে তাঁদের দলনেতার নাম জানিয়ে স্বীকৃতি দেবার অনুরোধ করেছেন। উদ্ধবের দিক থেকে পার্ষদ, বিদায়ক, সাংসদরা যত ফাঁকা হয়ে যাচ্ছেন, ততই প্রামাদ গুনছেন উদ্ধব ঠাকরে এবং তার দলের প্রধান মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত। রাউতের মাধ্যমে উদ্ধব বারবারই বলাচ্ছেন যে শিণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী হতে চাইলে বলুন, কিন্তু আগে দলের মূল স্রোতে পিরে আসুন। দল থেকে বহিষ্কার এবং বিধানসভায় সদস্যতা 'খারিজ'-এর ঘোষণার পরেও আবার দলে ফেরানোর এই তোড়জোড় থেকে পরিষ্কার যে, উদ্ধবের মুখ্যমন্ত্রিত্ব চলে যাবার পর এখন তিনি দল বাঁচাতে মরিয়া। এদিকে শিণ্ডেদের পরিষ্কার বক্তব্য যে, উদ্ধবকে সবার আগে কংগ্রেস-এনসিপির সঙ্গ ছাড়ার কথা ঘোষণা করতে হবে। জোট করতে হবে বিজেপির সঙ্গে। কিন্তু শেষ খবর পর্যন্ত উদ্ধব তাতে রাজি নন। একটি বিষয় লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এই প্রতিবেদক

বারবার উদ্ধবের কর্তৃত্বাধীন শিবসেনা শব্দ ব্যবহার করছেন। কারণ, বাস্তব ঘটনা হলো, এই মুহূর্তে উদ্ধব ঠাকরে সরকারিভাবে শিবসেনার সভাপতি হলেও তাঁর অবস্থা যাকে বলে ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারের মতো। মুকুট, রাজপোশাক, সিংহাসন বজায় আছে কিন্তু সৈন্যসামন্ত উধাও। এমনকী রাজ্যসভার ৪জন সদস্যের মধ্যে ৩জন শিণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক রাখছেন বলেও খবর পাওয়া গেছে। বিজেপির রণনীতির প্রাথমিক পর্ব এখানেই সফল।

নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের হিসাবনিকাশও রাজনীতির রণকৌশলের একটা বড়ো দিক। ১৯৯৫ থেকে দেখা যাচ্ছে, শিবসেনা যখন এবং যেখানে যেখানে দুর্বল হয়েছে সেখানে বিজেপির খুব একটা লাভ হয়নি। প্রথমদিকে লাভ হয়েছে কংগ্রেসের। এনসিপি গঠিত হবার পর লাভ হয়েছে তাদের। ২০১৪ সালে পৃথকভাবে লড়ে বিজেপি পেয়েছিল ১২২ আসন। শিবসেনা জিতেছিল ৬৯ আসনে। কেউ-ই অবশ্য ২৮৮ আসনের মধ্যে ১৪৫ আসন পায়নি। সেবার শিবসেনা বিজেপিকে সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। কিন্তু এনসিপির আসন কমে হয়েছিল ৪৫ টি। ২০১৯-এ বিজেপি-শিবসেনা জোট করে লড়ে। কিন্তু দু'দলেরই আসন কমে যায়। বিজেপি পেয়েছিল ১০৬ আর শিবসেনা ৫৬। অন্যদিকে এনসিপির আসন ৯টি থেকে বেড়ে হয় ৫৪ টি। রাজ্যের বিদর্ভ এলাকা, পশ্চিম মহারাষ্ট্র ও রাজধানী মুম্বইয়ে বিজেপির শক্তি বেশি নয়। এইসব এলাকায় মূল লড়াই এনসিপির বিরুদ্ধে শিবসেনার। আগামী লোকসভা ও বিধানসভায় এনসিপি, কংগ্রেস ও শিবসেনা জোট বেঁধে লড়লে এইসব এলাকায় এনসিপির বেশি সুবিধা হতে পারে। পওয়ারের শ্যেনদৃষ্টি এইদিকে নিবদ্ধ রয়েছে। শিণ্ডেরা বিজেপির মধ্যে চলে এলে মূল লড়াইটা হবে বিজেপি এবং এনসিপি নেতৃত্বাধীন মহা বিকাশ আঘাড়ির মধ্যে। তাতে উদ্ধবের নেতৃত্বাধীন শিবসেনার সুবিধা হবে না। সুবিধা হবে পওয়ারের দলের। সেটা যে এখনই বিজেপি নেতাদের কাম্য নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেজন্য বিজেপি চাইছে শিবসেনা থাকুক কিন্তু উদ্ধবের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের শিবসেনা নয়। পওয়ারের হাতের পুতুল উদ্ধবের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা চান না শিণ্ডেরাও। চান অন্তত এমন শিবসেনা যা মহা বিকাশ আঘাড়ির সঙ্গে থাকবে না। সেক্ষেত্রে বিজেপির সমর্থন পেলে এনসিপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শিবসেনার লাভের পাল্লা অনেক ভারী হতে পারে। তাই বিজেপির মতো শিণ্ডেসেনারাও চাইছেন শিবসেনার নেতৃত্বে চলে আসুক শিণ্ডে কিংবা তাঁর সমর্থকগোষ্ঠীর কারও হাতে এবং সেই শিবসেনা থাকুক এনডিএ-র সঙ্গে। সেই শিবসেনার হাতেই থাকুক নির্বাচনী প্রতীক তির-ধনুক। যা প্রথমে উঠেছিল বালাসাহেবের হাতে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, দু'পক্ষই দলের নাম ও প্রতীকের দাবি করেছে কমিশনের কাছে। নির্বাচনী প্রতীক সম্পর্কিত নিয়মের ১৫ ধারায় (১৯৬৪ সালের আইন) ফয়সালা হবে।

১৯৭৮ সালে নিজের দল কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী বসন্তদাদা পাতিলকে চক্রান্ত করে সরিয়ে দিয়ে নিজের গোষ্ঠী নিয়ে যে শরদ পওয়ার মহারাষ্ট্রের কুর্সি হাতিয়ে নিয়েছিলেন, সেই পওয়ারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে উদ্ধব ঠাকরে বালাসাহেব লিগ্যাসি যেভাবে শেষ করে দেবার মতো 'ভুল' করেছেন সেটা যাতে উদ্ধব মর্মে মর্মে ঠাহর করতে পারেন সেটা যেমন বিজেপির লক্ষ্য, তেমনই বালাসাহেবের রাজনীতির আদর্শে অনুপ্রাণিত একনাথ শিণ্ডেরও।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ হলো ইডি। ওয়াকিবহাল মহলের মতে কথাটা উচ্চারণ করে ফড়নবিশ কেবল এনসিপি এবং কংগ্রেস নেতাই নয়, শিবসেনার কিছু নেতাকেও বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যে ক্ষমতার অলিন্দে থাকাকালে তারা যে সমস্ত দুর্নীতি, অর্থ তছরূপ করেছেন, ইডির হাত থেকে এবার তাঁরা কেউ-ই রেহাই পাবেন না। প্রসঙ্গত, কংগ্রেসের প্রাক্তন দুই মুখ্যমন্ত্রী অশোক চৌহান ও পৃথ্বীরাজ চৌহানের বিরুদ্ধে ইডির তদন্ত চলছে। এনসিপির অজিত পওয়ার ছাড়াও খোদ এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পওয়ারের বিরুদ্ধেও চলছে ইডি তদন্ত। আর প্রায় ১১শো কোটি টাকার জমি দুর্নীতি মামলায় ইডি অন্তত দুবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছে শিবসেনার সঞ্জয় রাউতকে। যিনি 'একদিন না একদিন মুম্বাইয়ে আসতে হবে' বলে কার্যত হুমকি দিয়েছিলেন গুয়াহাটির হোটেলে অবস্থানরত একনাথ শিণ্ডেদের। এখন অনেক কিছুই নির্ভর করছে সুপ্রিমকোর্ট এবং সম্ভবত নির্বাচন কমিশনের রায় ও সিদ্ধান্তে ওপর। শেষকথা তারাই বলবেন।

With Best
Compliments from -

A
Well Wisher

শ্যামলকান্তি সেনগুপ্ত

সুধাময় দত্ত

দীনেন্দ্রনাথ দে

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

ত্রিপুরায় চার বলিদানী স্বয়ংসেবক

২০০১ সালের ২৮ জুলাই। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের লক্ষ লক্ষ স্বয়ংসেবকের জন্য একটি কালো দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই দিনে ভারত সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের কাঞ্চনছড়ায় অবস্থিত বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের একটি ছাত্রাবাস থেকে ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা-র উগ্রপন্থীরা ১৯৯৯-এর ৬ আগস্ট অপরহরণ করা চারজন সঙ্ঘ কার্যকর্তার মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করে।

চারজনের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ছিলেন ক্ষেত্র কার্যবাহ শ্যামলকান্তি সেনগুপ্ত। বয়স ৬৮ বছর। তিনি সুপাতলা গ্রামে (মহকুমা করিমগঞ্জ, জেলা শ্রীহট্ট, বর্তমান বাংলাদেশ) জন্মগ্রহণ করেন। সুশীলচন্দ্র সেনগুপ্তের পাঁচ পুত্রের মধ্যে শ্যামলকান্তি ছিলেন জ্যেষ্ঠ। দেশভাগের পর তাঁদের পরিবার অসমের শিলচরে চলে আসে। ম্যাট্রিকুলেশন করার সময় তিনি প্রচারক বসন্তরাও, কার্যকর্তা কবীন্দ্র পুরকায়স্থ এবং নর্থ ইস্ট ইউনিভার্সিটির দর্শনের অধ্যাপক উমারঞ্জন চক্রবর্তীর সংস্পর্শে স্বয়ংসেবক হন। ম্যাট্রিকুলেশন করার সময়ে তাঁর বাবা পরলোকগমন করেন। সংসারের দায়িত্ব কাঁধে আসায় জীবন বিমা কর্পোরেশনে চাকরি গ্রহণ করেন। চাকরি করতে করতে এম.কম পাশ করেন। চাকরি সূত্রে তিনি ১৯৬৫ সালে কলকাতায় আসেন। চাকরির পাশাপাশি তিনি সঙ্ঘকার্যেও সক্রিয় ছিলেন। ১৯৯২ সালে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে পূর্ণ সময় দিয়ে সঙ্ঘের কাজে লেগে পড়েন।

দীনেন্দ্র দে ১৯৫৩ সালে কলকাতার উল্টাডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ দে ডাক বিভাগের একজন কর্মচারী ছিলেন। পরে এই পরিবার সোনারপুরে চলে যায়। ১৯৬৩ সালে তিনি সোনারপুর বৈকুণ্ঠপুর শাখায় স্বয়ংসেবক হন। ডায়মন্ড হারবার ফকিরচাঁদ কলেজে গণিতে (অনার্স) অধ্যয়নকালে তিনি বিদ্যার্থী বিস্তারক রূপে কাজ আরম্ভ করেন। শিক্ষা সমাপ্ত করে প্রচারক হিসেবে তিনি বহরমপুর নগর প্রচারক, মুর্শিদাবাদ সহ জেলা প্রচারক, কোচবিহার, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের জেলা প্রচারক হন। এরপর বিভাগ প্রচারক, প্রান্তীয় শারীরিক প্রমুখ থাকাকালীন বনবাসীদের মধ্যে সেবামূলক কাজেও নিয়োজিত ছিলেন।

৫১ বর্ষীয় সুধাময় দত্ত। মেদিনীপুর শাখার স্বয়ংসেবক। বিএসসি পাশ করার পর প্রচারক হন। প্রথমে তিনি হুগলি জেলার চুঁচুড়া নগর প্রচারক, বালুরঘাট নগর প্রচারক এবং মালদহ জেলা প্রচারক হন। সাংবাদিকতার প্রতি আগ্রহ দেখে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'স্বস্তিকা'-র ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। অপহরণের সময় তিনি আগরতলায় বিভাগ প্রচারক ছিলেন।

৩৮ বর্ষীয় শুভঙ্কর চক্রবর্তী। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার স্বয়ংসেবক। এলএলবি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি প্রচারক হন। বর্ধমান জেলার কালনা ও কাটোয়াতে কাজ করার পর তাঁকে ত্রিপুরায় পাঠানো হয়। অপহরণের সময় তিনি ত্রিপুরার ধর্মনগর জেলা প্রচারক ছিলেন।

এই চারজনের মৃত্যুর খবর স্বয়ংসেবকদের কাছে হৃদয়বিদারক। কিন্তু তাঁদের পরিবারের মর্মবেদনা এর চেয়ে অনেক বেশি, যা আজও শেষ হয়নি। যেহেতু এই চারজনের মৃতদেহ পাওয়া যায়নি, তাই তাদের আনুষ্ঠানিক শেষকৃত্য করাও সম্ভব হয়নি। প্রতি বছর ২৮ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার স্বয়ংসেবকরা তাঁদের প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধা অর্পণ করেন। □

মৈত্রী তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের উদ্বোধনে নরেন্দ্র মোদী ও শেখ হাসিনা

বিশেষ সংবাদদাতা।। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে ভারত সফরে আসছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনদিনের এই সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে যৌথভাবে ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন মৈত্রী সুপার পাওয়ার থার্মাল বিদ্যুৎকেন্দ্র উদ্বোধন করবেন তিনি। প্রকল্পটি বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার রামপালে অবস্থিত। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎকেন্দ্র হিসেবে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি স্থাপন করছে বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড। দেড় বিলিয়ন ডলারের এই প্রকল্পটি মূলত ভারতের এনটিপিসি এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একটি যৌথ উদ্যোগ। ৫-৭ সেপ্টেম্বর ভারত সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সূত্রের খবর, এ সময়ে তিনি দিল্লিতে অবস্থান করবেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দিল্লিতে পৌঁছানোর আগে কলকাতা-চট্টগ্রাম-মংলা

বন্দরের মধ্যে ট্রায়াল রান দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্কে এক নতুন অধ্যায় তৈরি করবে। এর ফলে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পৌঁছনোর জন্য সহজ বিকল্প পথ তৈরি হবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের পক্ষেও এই পথে আমদানি, রপ্তানির কনটেনার ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হবে। ভারতের ঘনিষ্ঠ মিত্র দেশ হওয়ার সুবাদে ভারত সরকার দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশে গম রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে। ভারত বাংলাদেশকে প্রায় ৬৬ শতাংশ গম সরবরাহ করে।

হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানকে গণআন্দোলনে রূপান্তরের ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী

বিশেষ সংবাদদাতা।। ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ অভিযান দেশের প্রতিটি কোণায় পৌঁছে দিতে সোশ্যাল মিডিয়ার মিডিয়ার ডিপি প্রোফাইল বা ডিসপ্লে পিকচারকে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত করার ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত ৩১ জুলাই রেডিয়োয় ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপের মতো সমাজমাধ্যমে স্বাধীনতা দিবসের আবেগকে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেন তিনি। দেশবাসীর উদ্দেশে তাঁর আহ্বান, ২ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত সমস্ত ভারতবাসী তাঁদের সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলকে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত করুন। ঘরে ঘরে জাতীয় পতাকা তোলা হোক। হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান একটা গণআন্দোলনের রূপ পাক। প্রসঙ্গত, ভারতের স্বাধীনতা এবছর পঁচাত্তর বছরে পা দিচ্ছে। সেই উপলক্ষ্যে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পালন হচ্ছে দেশজুড়ে। তারই একটি অংশ হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের আওতায় একটি বিশেষ আন্দোলন হচ্ছে হর ঘর তিরঙ্গা। এই বিষয়ে আমার একটা পরামর্শ রয়েছে। প্রত্যেকের সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলে তিরঙ্গা লাগানো হোক। এই আন্দোলন আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রত্যেক বাড়িতে জাতীয় পতাকা তোলা হোক।’

এ দিনের মন কি বাত অনুষ্ঠান নিয়ে যে সরকারের বিশেষ চিন্তাভাবনা আছে, তার পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল মাসের শুরুতেই। ৩১ জুলাই পর্বটির বিষয়ে পরামর্শ করতে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক ডেকেছিলেন তিনি। টুইট করে বলেছিলে, ‘‘৩১ জুলাই যে মন কি বাত-এর সম্প্রচার হবে তা নিয়ে আপনাদের কি কোনও মতামত দেওয়ার আছে? আমি সেগুলো শোনার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। আমার অ্যাপে তা শেয়ার করতে পারেন।’’ এ প্রসঙ্গে রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, নরেন্দ্র মোদীর বিভিন্ন রাজনৈতিক কৌশলের একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে জাতীয়তাবোধের আবেগ। ৩১ জুলাই ছিল উধম সিংহের মৃত্যুদিন। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানের শুরুতে পঞ্জাবের এই স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী। এ দিন তিনি আত্মনির্ভর ভারতেরও উল্লেখ করেন। তিনি জানান, ভারতের তৈরি খেলনার চাহিদা বাড়ছে দেশে ও বিদেশে। কমেছে বিদেশ থেকে আমদানি করা খেলনার পরিমাণ। আগে চীন-সহ বিভিন্ন দেশ থেকে বছরে ৩ হাজার কোটি টাকার খেলনা ভারতে আসত। ইদানীং তার ৭০ শতাংশ আমদানি কমেছে। অন্যদিকে বেড়েছে মেক ইন ইন্ডিয়া খেলনার রপ্তানি। গত এক বছরে ২ হাজার কোটি টাকার দেশীয় খেলনা রপ্তানি হয়েছে। ভারতবাসীকে দেশীয় খেলনা কেনার অনুরোধ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

ভারতের শেয়ার বাজারে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ছে

বিশেষ সংবাদদাতা ।। কোভিড পরিস্থিতিতে বাড়ন্ত ছিল বিদেশি বিনিয়োগ। সেই অচলাবস্থা কাটিয়ে ফের ভারতের বাজারে বিদেশি সংস্থাগুলো বিনিয়োগ করতে শুরু করেছে। একটা সময় কোভিডের ডামাডোলে টানা ন'মাস ধরে ভারতের শেয়ারবাজার থেকে তাদের বিনিয়োগ তুলে নিয়েছিল বিদেশি বিনিয়োগকারীরা। গত জুলাইয়ে পুনরায় এদেশের বাজারের উপর বিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে বিদেশি সংস্থাগুলি। গত মাসে ভারতের শেয়ারবাজারে প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন তারা। বিশেষজ্ঞদের মতে,

গত কোয়ার্টার আর্থিক বছরে ভারতীয় সংস্থাগুলির ভালো আর্থিক ফলাফল এবং টাকার সাপেক্ষে ডলারের দাম নিম্নমুখী হওয়ায় ফের বিনিয়োগ আকর্ষণ বাড়ছে দেশের শেয়ারবাজারের।

জুন মাসে ভারতের শেয়ারবাজার থেকে নিট ৫০,১৪৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ তুলে নিয়েছিলেন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা। ২০২০ সালের মার্চের পর এই প্রথম অতবড়ো বিনিয়োগ শেয়ারবাজার থেকে বেরিয়ে যায়। দু'বছর আগের মার্চে ৬১,৯৭৩ কোটি টাকার বিনিয়োগ হারিয়েছিল বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ ও ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ। ইয়েস সিকিওরিটিজ-এর মুখ্য বিশ্লেষক হিতেশ জৈন মনে করেন, আগস্টে বিদেশি বিনিয়োগের এই ধারা বজায় থাকবে। ডলারের তুলনায় টাকার পতনের ধাক্কা ভারতের বাজার কাটিয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, বিশ্ববাজারে তেলের দাম নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই ঘোরাফেরা করবে বলে তাঁর মত। পাশাপাশি দেশীয় সংস্থাগুলির আয়ের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা তাদের মুনাফা সংকোচনকে ছাপিয়ে গেছে। দেশের ডিপোজিটরগুলির দেওয়া তথ্য অনুসারে জুলাইয়ে ভারতের শেয়ারবাজারে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা নিট ৪,৯৮৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। মাসে ৯ দিন ভারতের শেয়ার কিনেছে বিদেশি সংস্থাগুলি। বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে ভারতের শেয়ারবাজারের গ্রাফ ফের উপরে উঠতে শুরু করেছে।

পরলোকে প্রবীণ প্রচারক বিদ্যুৎ দত্ত

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রবীণ প্রচারক বিদ্যুৎ দত্ত গত ২ আগস্ট

পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার দায়িত্ব পালন করেছেন। বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি, রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক-সহ বিভিন্ন দায়িত্ব সফলতার সঙ্গে পালন করেছেন। প্রবীণ প্রচারক হিসেবে বাঁকুড়া সংঘ কার্যালয়ে থাকতেন। কয়েকদিন আগে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ডাঃ সুভাষ সরকারের নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

শোকসংবাদ

গত ১৬ জুলাই কৃষ্ণা ভট্টাচার্য কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন। বেশ কিছুদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন। সঙ্ঘের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা প্রাক্তন প্রচারক দেবতনু ভট্টাচার্যের তিনি মাতৃদেবী। তাঁদের পরিবার মূলত আসানসোলের বাসিন্দা। পুরো পরিবারই হিন্দুত্ব আদর্শের বাহক। তিনি কিছুদিন বিজেপির রাজ্য সহ-সভানেত্রী ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তিনি এক পুত্র ও বহু গুণমুগ্ধ আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

* * *

হাওড়া জেলার মাঝেরহাটি শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক নয়ন সিংহরায় গত ২৭ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করার পর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দায়িত্ব পালন করেন। পরে তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশুমন্দিরের কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদক ও সভাপতির দায়িত্ব এবং শেষে ভারতীয় জনতাপার্টির দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন। উল্লেখ্য, তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী অমরেন্দ্রনাথ সিংহরায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন।

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৯

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

দেবী প্রসঙ্গ

স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ

উপন্যাস

প্রবাল - বায়ু বহে পূর্ব সমুদ্র হতে ● **এষা দে** - একটি কাল্পনিক কাহিনি
সুমিত্রা ঘোষ- স্বপ্ন ধরার জন্য

জীবনী

বিজয় আঢ্য

পুরাণ

ড. জয়ন্ত কুশারী

বড়ো গল্প

সন্দীপ চক্রবর্তী - বাঁধন

গল্প

শেখর সেনগুপ্ত, দীপ্তাস্য যশ, নিখিল চিত্রকর, সিদ্ধার্থ সিংহ

প্রবন্ধ

রঙ্গাহরি, নন্দলাল ভট্টাচার্য, প্রবীর আচার্য, সুজিত রায়,
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুজিত ঘোষ

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ১০।।

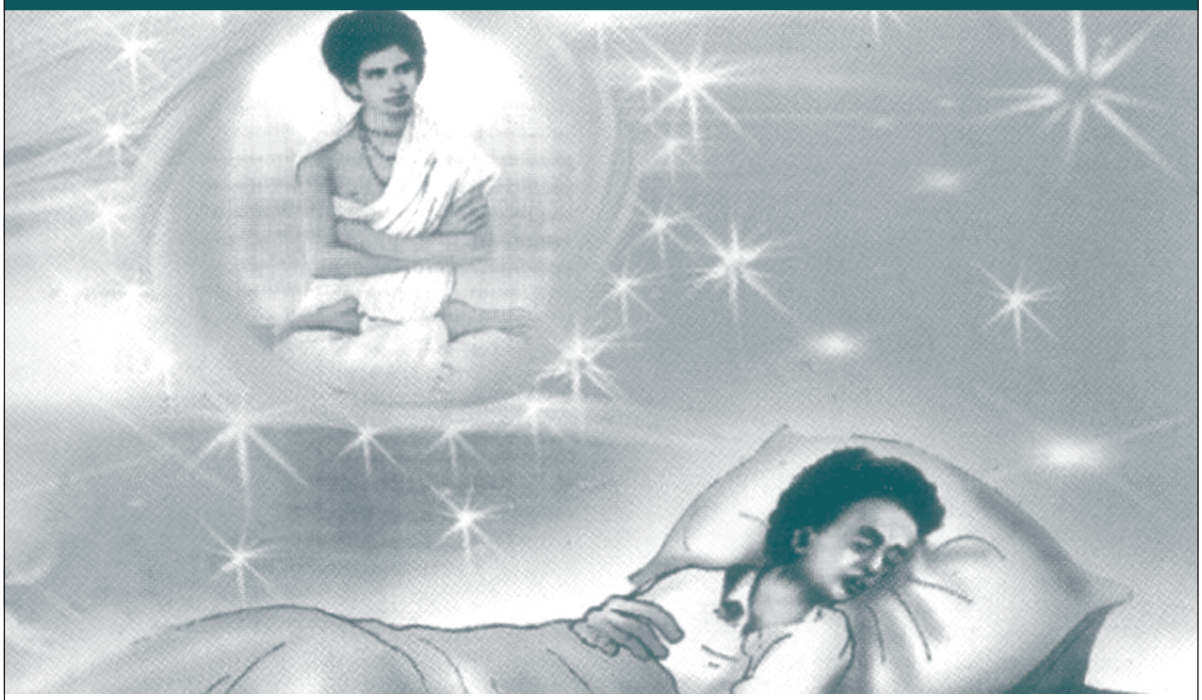

বালক বঙ্কিম একদিন স্বপ্নে এক জ্যোতির্ময় পুরুষের দর্শন পেলেন। পরে মহেন্দ্রজীর কৃপাপ্রাপ্ত বরিশালে বালক-ভক্ত রাজেন্দ্রর (সংকর্ষণ দাস) কাছে প্রভুর ছবি দেখে জানলে পারলেন — তাঁর স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষই প্রভু জগদ্বন্ধু।

শ্রীশ্রী প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের প্রধান লীলাস্থলী ছিল শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর, তিনি রাধাকৃষ্ণ নিতাই গৌর মিলিত বিগ্রহ -স্বয়ং ভগবান। অলৌকিক ভাবে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বৃন্দাবন থেকে আসেন মহেন্দ্রনাথ। পরে তিনি শ্রীপাদ্ মহেন্দ্রজী নামে খ্যাত হন।

(ক্রমশ)